শতাব্দীতে বারাণসী ধামে অধ্যয়ন করেন। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির সময় হইতেই নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্র চর্চ্চার আরম্ভ হয় এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় ইহা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহার স্থাপিত নব্যস্মৃতি এখনও বাঙালী হিন্দুদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমূতবাহনের দায়ভাগের টীকা ও "দায়ক্রম সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ কোলব্রুক সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস হিন্দু আইনের প্রামাণিক বিধি প্রস্তুতের জন্য বাংলার নানা স্থান হইতে এগার জন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন; ইহাদের মধ্যে দুইজন রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও বীরেশ্বর পঞ্চানন নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এই পণ্ডিত মণ্ডলী "বিবাদার্ণব সেতু" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন; উহা প্রথমে ইরাণীয় ও পরে ইংরেজীতে অনুদিত হয়।

নবদ্বীপে বহুকাল হইতে জোতিঃশাস্ত্রেরও বিশেষ চর্চ্চা আছে। "জ্যোতিঃসার সংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা জোতিষী হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব, তৎকালের নবদ্বীপের পঞ্জিকাকার রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামজয় শিরোমণি, শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কমলাকর জ্যোতিষী, গণিতাচার্য্য বংশীয় বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি, হারাধন বিদ্যাভরণ, নানা শাস্ত্রবিদ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন বিশিষ্ট সাধক ও মহাপুরুষ ছিলেন; তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আগমবাগীশ নামে পরিচিত হন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের দেবী মূর্ত্তির সাকার পূজাবিধির প্রচলন করেন। আধুনিক কালের কালী বা শ্যামা মূর্ত্তি কৃষ্ণানন্দের উদ্ভাবিত বলিয়া কথিত। "তন্ত্রসার" নামক তাঁহার গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

আজিও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের "বঙ্গবিবুধ জননী সভা" যাহা পূর্ব্বে "বিদগ্ধ জননী সভা" নামে খ্যাত ছিল ও "নবদ্বীপ সমাজ" নামে দুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান আছে।

নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের নিবাসভূমি এই নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান গৌরব ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভূমি বলিয়া। এই জন্যই ইহার তীর্থ গৌরব, এই জন্যই ইহার "শ্রীধাম" আখ্যা, এই জন্যই ইহা বাংলার "বৃন্দাবন" রূপে সম্মানিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহামারী ও দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাদের আদি বাসস্থান শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া পরিজনগণসহ নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাসন্তী সন্ধ্যার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তদীয় জননী শচীদেবীর আটটি সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার জন্ম সময়ে তদীয় অগ্রজ বিশ্বরূপ কিশোরবয়স্ক বালক ছিলেন। বিশ্বরূপ পরে ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন। জগন্নাথ মিশ্র নবজাত পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বম্ভর,—অকাল মৃত্যুর হাত হইতে সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য পুরস্ত্রীগণের পরামর্শ মত শচীদেবী পুত্রের নাম রাখেন নিমাই। নিমাইএর গায়ের রং অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বা গৌর বলিতেন। ষোল বৎসর বয়সে পড়াশুনা শেষ করিয়া নিমাই "পণ্ডিত"

নামে প্রসিদ্ধ হন এবং নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপক হইয়া বসেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহাদের প্রতিবেশী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর লোকান্তর ঘটে। গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। অধ্যাপক হিসাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিপুল খ্যাতি হয় এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া তিনি নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিতে গিয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় এবং সেই স্থানেই তিনি ভক্তিপন্থী সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত পরিকরের সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। নবদ্বীপের বিখ্যাত পাষণ্ড জগাই ও মাধাইকে তিনি প্রেমের দ্বারা বশীভূত করেন এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তির খ্যাতি বিস্তৃত হয়। গয়া হইতে ফিরিবার তিন বৎসর পরে ১৪৩১ শকে (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে) উত্তরায়ণের দিন কাটোয়ায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিয়া তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নব নামকরণ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি যৎকালে সংকীর্ত্তন রসে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে বৈষ্ণব প্রধান নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। নবদ্বীপবাসিগণ ক্রমে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকেন। অতঃপর চৈতন্যদেব বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বহু স্থানে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করেন। ১৪৫৫ শকের (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসে তিনি এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর এই জগতে থাকিয়া তিনি যে প্রেমধর্ম্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভাবধারায় উহা বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার মহান্ জীবন অবলম্বন করিয়া যে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলা ভাষার তাহা অপূর্ব্ব সম্পদ। তাঁহার পুণ্যপদস্পর্শে বাংলা ও ওড়িষ্যার বহু অখ্যাত স্থান তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে অর্চ্চনা করেন এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেমিক মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন।

বাংলার বৃন্দাবন নবদ্বীপে দেখিবার বস্তু আছে অনেক। তন্মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যে মন্দিরে এই বিগ্রহের পূজা হয় উহা "মহাপ্রভু বাটী" নামে পরিচিত। নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়া-মা তলা, বুড়া শিবের মন্দির, পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরী তলা, সোনার গৌরাঙ্গ, বড় আখড়া বা শ্যামসুন্দর মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুর বাটী, নিত্যানন্দ মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, মণিপুর রাজের স্বর্ণচূড় মন্দির, কাচকামিনীর মন্দির, চরণদাস বাবজীর সমাজ বাগ, মাধাইএর ঘাট, প্রভৃতি তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। পোড়া-মা তলা বা জগন্মাতা দেবীর ঘট বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। সাধকের তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবী প্রত্যহ দুই দণ্ডকাল নবদ্বীপে অধিষ্ঠান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দেবীর ঘটটিকে গ্রামের মধ্যে আনিয়া বর্ত্তমান বটবৃক্ষের ছায়ায় স্থাপন করেন; একবার গাছটি পুড়িয়া গেলে দেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়ামা নামে আখ্যাতা হন। নবদ্বীপের পল্লীমাতা বা পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দেবতা। কথিত আছে একজন সিদ্ধপুরুষ ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু সাধক এই স্থানে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। ইনি বিশেষ জাগ্রত বলিয়া খ্যাত।

কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় নবদ্বীপে নিত্যই মহোৎসব লাগিয়া আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানকার দেবমন্দিরগুলিতে কীর্ত্তন, পাঠ ও কথকতা প্রভৃতি হয়। নবদ্বীপের উৎসবের মধ্যে বৈশাখে চন্দন যাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, মাঘে ধুলোট ও ফাল্গুনে গৌর পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা বিশেষ বিখ্যাত। মাঘী শুক্লা একাদশী হইতে ১২ দিন ধরিয়া ধুলোট মেলায় বাংলার সমস্ত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াগণ সদলবলে মিলিত হন। গৌর বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া প্রধান বৈষ্ণব মহান্তগণের মৃত্যু তিথিতে এবং গ্রহণ প্রভৃতি গঙ্গাস্নানের যোগে নবদ্বীপে দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃহৎ কালী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা ও দুইদিন ব্যাপী মেলা হয়। ইহা পট পূর্ণিমার মেলা নামে খ্যাত।

নবদ্বীপে যাত্রিগণের থাকিবার জন্য বহু ধর্ম্মশালা, যাত্রীনিবাস ও আখড়া আছে।

এখানকার ঢালাই করা দেব দেবীর মূর্ত্তির বিশেষ খ্যাতি আছে।

আদি নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। কাহারও কাহারও মতে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের জন্য আদি নবদ্বীপ লুপ্ত হওয়ার ফলে বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আদি নবদ্বীপ বর্ত্তমান নবদ্বীপের নিকটে উত্তরদিকে একটি স্থানে এবং মতান্তরে গঙ্গার পরবর্তীরবর্ত্তী মায়াপুরে অবস্থিত ছিল। পূর্ববঙ্গ রেলপথের নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপ বাসী শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় পার্ষদ ও কীর্ত্তনিয়া ছোট হরিদাস অধুনা ব্যবহৃত মৃদঙ্গ বা খোলের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া কথিত। ইনি একবার শিখি মাহাতির বৃদ্ধা ভগিনীর নিকট ভিক্ষা লইলে চৈতন্যদেব রুষ্ট হইয়া বলেন—

"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"

চৈতন্য চরিতামৃত।

হরিদাস দুঃখে ক্ষোভে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত "চৈতন্য ভাগবত" ও "নিত্যানন্দ বংশমালা" প্রসিদ্ধ পুস্তক। প্রথমোক্ত গ্রন্থ চৈতন্য দেবের জীবনী সম্বন্ধীয় বাংলা ভাষায় একখানি মূল্যবান্ পুস্তক।

নবদ্বীপের সহজে পাড়ায় সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র আছে। এই সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায়ের প্রকার ভেদ। ইহাদের বহু গুরু মানিতে বাধা নাই ; ইহারা বলেন,

গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার।
মনের আঁধার যে ঘুচাবে দায় দিব তার॥

নবদ্বীপের মতিলাল রায়ের যাত্রার দল আধুনিক কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি বহু পালা রচনা করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে কবিরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরল্যা গ্রাম হইতে পিরালী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের ঘাটগম্বজ রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বংশীয় সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র, "চৈতন্য মঙ্গল" প্রণেতা কবি জয়ানন্দের জন্ম হয়। চৈতন্য দেবই বাল্য কালে তাঁহাকে জয়ানন্দ নাম দেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের অনুরোধে জয়ানন্দ "চৈতন্য মঙ্গল" রচনা করেন। ইহা একখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের তথ্যপূণ গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবে তিরোধানের কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে কীর্ত্তন করিতে করিতে পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হন ও আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমীতে পুরীধামে পরলোক গমন করিলে জগন্নাথ মন্দিরে প্রস্তরমধ্যে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। জয়ানন্দ "ধ্রুবচরিত্র" ও "প্রহলাদ চরিত্র" নামে দুখানি ক্ষুদ্র কাব্যও লিখিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে একডালা পরাণপুর নামক গ্রামে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে মনোহর দাস নামে একটি দুর্দ্ধান্ত ডাকাতের সর্দ্দার বাস করিত। তাহার সঙ্গী নয়না ও মানিকার সহিত নানাস্থানে অত্যাচার করিত; অবশেষে ধরা পড়িলে মনোহরের নির্ব্বাসন দণ্ড হয় এবং ক্লারিসা নামক জাহাজযোগে তাহাকে ব্রহ্মে পাঠান হয়। জাহাজ সমুদ্রে পড়িলে মনোহর অন্যান্য কয়েদীদের সহিত মিলিয়া বিদ্রোহী হয় এবং অতর্কিতে কাপ্তেন প্রভৃতিকে হত্যা করে; কয়েকজন দেশীয় খালাসীর প্রাণ রক্ষা পায় এবং তাহাদের সাহায্যে মনোহর জাহাজ লইয়া অন্যত্র পলাইতে থাকে। শেষে একখানি রণতরী আসিয়া তাহাদের ধরিয়া আকিয়বে লইয়া যায়। তথায় তাহাদের ফাঁসী হয়।

পূর্ব্বস্থলী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৪৫ মাইল। আধুনিক কালের বিশিষ্ট পণ্ডিত, বহু গ্রন্থ ও ভাষ্য প্রণেতা কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এখানকার অধিবাসী ছিলেন। ইনি ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে বৃত ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজ কর্ত্তৃক "পণ্ডিতকুল চক্রবর্ত্তী" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

পূর্ব্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী জহ্নু নগরে পূর্ব্বে বহু মন্দির ও চতুস্পাঠী ছিল। প্রবাদ জহ্নুমুনি এই স্থানে এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে এখানে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণী মেলা ও "গাছ পূজা" হইতেছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহাকে ব্রাহ্মণী পজা বলা হইয়াছে। গাছ পূজার পদ্ধতি দেখিয়া অনেকে ইহা বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে মনে করেন।

পূর্ব্বস্থলীর পার্শ্বস্থ চুপীগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। ইঁহারই পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার অনুপম ছন্দ ঝঙ্কারে বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। "বেণু ও বীণা," "কুহু ও কেকা" "তীর্থ সলিল," "হোমশিখা" প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থ ইঁনি রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিখ্যাত কবিতা "আমরা বাঙ্গালী বাস করি এই তীর্থে বরদবঙ্গে" ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বস্থলী স্টেশন হইতে আন্দাজ ৬ মাইল পশ্চিমে মন্তেশ্বর থানায় শুক্রো বা শুরো বলিয়া যে গ্রাম আছে উহার প্রাচীন নাম শূরনগর বলিয়া কথিত। মহারাজ আদিশূরের বৃদ্ধাবস্থায় গৌড়ীয় বৌদ্ধগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পরম বৌদ্ধ গোপাল দেবকে সিংহাসনে বসাইলে আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড় ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ রাজাদের সান্নিধ্যে শূরনগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূশূর ও তাঁহার পুত্র ক্ষিতিশূর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন। ক্ষিতিশূর গৌড়ের বৌদ্ধ নৃপতি দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন বলিয়া কথিত। শুকরোর ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাইগাঁর সহিত মহারাজ আদিশূরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কথিত। সমুদ্রগড় স্টেশন দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বস্থলী স্টেশন হইতে আন্দাজ ১১ মাইল পশ্চিমে শুক্রো ছাড়াইয়া মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামে "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাস প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। বৈষ্ণবগণের নিকট উহা দেনুড় শ্রীপাট নামে পরিচিত।

অগ্রদ্বীপ—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৫৭ মাইল দূর। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে চারি শত বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ নামক এক বিগ্রহ আছেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। চৈতন্যদেব যখন গঙ্গাতীরের পথ দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন তখন গোবিন্দ ঘোষ তাঁহার সহচর ছিলেন। একদিন আহারের পর চৈতন্যদেব মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ নিকটস্থ এক গৃহস্থ বাটি হইতে একটি হরিতকী চাহিয়া আনিয়া উহার এক খণ্ড তাঁহাকে প্রদান করেন। পরদিন অগ্রদ্বীপে পৌছিয়া ভোজনান্তে চৈতন্যদেব গোবিন্দের নিকট পুনরায় মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত হরিতকী খণ্ড তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে চৈতন্যদেব বলিলেন, "গোবিন্দ, তোমার বিষয় বাসনা এখনও যায় নাই; বৃন্দাবনে তোমার যাওয়া হইবে না।" ইহাতে গোবিন্দ অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া বলিলেন, "তোমার সেবা করিব বলিয়াই আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া কিছুতেই এখানে থাকিব না।" তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, "তুমি এখানে এক বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা কর, তাহা হইলে আমার সেবা করা হইবে।" শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মত গোবিন্দ ঘোষ গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অন্তিমকালে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহাদের মধ্যে কে তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী হইবেন। ইহাতে ঘোষ ঠাকুর উত্তর দেন যে গোপীনাথকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন, গোপীনাথ দেবই তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী। আজিও প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণ দ্বাদশী তিথিতে গোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রাদ্ধোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত করা হয়। বারুণী উপলক্ষে অগ্রদ্বীপে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ সাহেবধনী নামক সম্প্রদায়ের একটি উৎসব প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবধনী নামক একজন ফকিরের দুই জন হিন্দু ও এক জন মুসলমান শিষ্য মিলিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন।

দাঁইহাট—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৬১ মাইল। কথিত আছে, মহারাষ্ট্র বর্গীদলের নেতা ভাস্কর পণ্ডিত এই স্থানে ছাউনি করিয়া দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ জগৎরাম রায়ের চিতাভস্ম এই স্থানে রক্ষিত আছে।

দাঁইহাট পূর্ব্বে একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। এখনও এই স্থানে পিতল ও কাঁসার বাসন এবং উত্তম তসরের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার ভাস্করগণ এখনও সুন্দর সুন্দর পাথরের দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী নলাহাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রুদ্ররাম তর্কবাগীশ নবদ্বীপ হইতে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থ নিরূপণ" ও রৌদ্রী" নামক টীকা গুলি প্রসিদ্ধ।

দাঁইহাট হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে নদীয়া জেলার মেটেরী গ্রামের রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক খানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

কাটোয়া জংশন—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৬৫ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি ভাগীরথীর সহিত অজয়নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মুসলমান আমলে কাটোয়া একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গের অনতিদুরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন এই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয় দিগের অধিকারে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্লাইভ এই দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ করেন এবং এখান হইতেই তিনি সিরাজউদ্‌দৌলার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখন লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। কাটোয়ায় মুর্শিদকুলী খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি বড় মসজিদ্ আছে।

কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে কাটোয়া "কন্টকনগর" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে দাস গদাধর নামক চৈতন্যদেবের একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের পাট অবস্থিত।

কাটোয়া হইতে ২ মাইল দূরে ঝামটপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ "চৈতন্যচরিতামৃত"-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীপাট। অনুমান ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। কথিত আছে, নিত্যানন্দের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় বাংলায় "অদ্বৈত সূত্রকড়চা" "স্বরূপ বর্ণন," "রাগময়ী কণা" প্রভৃতি গ্রন্থ ও সংস্কৃতে "গোবিন্দ লীলামৃত" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। বৃন্দাবন দাস কৃত প্রামাণিক গ্রন্থ "চৈতন্য-ভাগবতে" শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বিস্তারিত না থাকায় বৃন্দাবনের শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ৮০ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ৯ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণদাস ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ "চৈতন্য চরিতামৃত" শেষ করেন। এই গ্রন্থে ১২০৫১টি শ্লোক আছে। গ্রন্থ শেষ হইলে জীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা অনুমোদন করিলে কৃষ্ণদাসের নিজ হস্ত লিখিত পুঁথি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে গৌড়ে প্রেরিত হয়। পথে বন বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীরের লোক কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হয়; এই সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে শোকে ও হতাশায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তদবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। বাংলা-নাগপুর রেলপথের বিষ্ণুপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ যে দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাস্নান করেন বলিয়া স্থানের নাম ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী হয়। এ বিষয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

"নিমেষেতে আইলেন গ্রাম ইন্দ্রেশ্বর।
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর॥
গঙ্গা জলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥"

ইন্দ্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণীতে পূর্ব্বে বারটি ঘাট ছিল এবং উহার প্রত্যেকটি তীর্থরূপে গণ্য হইত। কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

বর্ত্তমানে ইন্দ্রাণী একটি পরগণার নাম। ইন্দ্রাণীর অন্তগত সিঙ্গিগ্রাম বাংলা মহাভারত প্রণেতা মহাকবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দেব উপাধিধারী এক কায়স্থবংশে কাশীরাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব; কমলাকান্তের তিন পুত্র, কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। এই তিন ভ্রাতাই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস "শ্রীকৃষ্ণ বিলাস" নামক কাব্য রচনা করেন, তাঁহার গুরুদত্ত নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক "জগন্নাথ মঙ্গল বা জগৎ মঙ্গল" নামে এক কাব্য রচনা করেন। অনেকে অনুমান করেন যে কাশীরাম মহাভারতের আদি, সভা, বন এবং বিরাট পর্ব্বের কতকাংশ রচনা করিবার পর পরলোক গমন করেন। বিরাট অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের অবশিষ্ট ভাগ তদীয় সুযোগ্য পুত্র নন্দরামের রচনা। নন্দরাম পিতার আরব্ধ কার্য্য পিতার নামের ভনিতা দিয়াই সমাপন করেন। সিঙ্গিগ্রামের এই দেব বংশের মত একই বংশে একই সময়ে এতগুলি প্রতিভাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। সিঙ্গিগ্রামে এখনও "কাশীর ভিটা" ও কেশে-পুকুর কবির স্মৃতি বহন করিতেছে।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সীতাহাটি গ্রামে প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। উহা কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই তাম্রশাসন খানির দ্বারা বল্লালসেন রাজমাতা বিলাস দেবীর সূর্য্যগ্রহণ কালীন হোমাশ্ব মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তগত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলের বাল্লহিট্ট গ্রাম সামবেদী শ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে দান করেন।

কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুর ডিহি গ্রামে বাংলার প্রথম "বঙ্গাধিকারী" ভগবান্ রায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের মুর্শিদাবাদ ষ্টেশন দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটস্থ যাজিগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতুলালয় ছিল। নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়; তথায় কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি যাজিগ্রামে আসিয়া বাস করেন; তথা হইতে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য চরিতামৃত" শেষ হইলে সেই গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসা কালীন বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দিয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া আসেন ও ধর্ম্মচর্চাতে আত্মনিয়োগ করেন।

কাটোয়া একটি জংশন স্টেশন। ইহা বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া ও আহম্মদপুর-কাটোয়া নামক ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে রেলপথের সংযোগস্থল।

কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমানের দিকে এই রেলপথে শ্রীখণ্ড, কৈচর ও নিগন উল্লেখযোগ্য স্টেশন। কাটোয়া জংশন হইতে **শ্রীখণ্ড** ৫ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং অনুরক্ত ভক্ত রঘুনন্দন ও মুকুন্দ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। "নরহরি গৌর-লীলার পদ রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে আদৃত।" এই স্থানে সরকার ঠাকুরের শ্রীপাটে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। নরহরি নাগরীভাবের উপাসক ছিলেন। কবি কর্ণপুর তৎকৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় নরহরিকে ব্রজের মধুমতী সখীর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ-দ্বাদশী তিথিতে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে "মধুমতী উৎসব" নামে একটি মেলা হয়। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীখণ্ড পণ্ডিতপ্রধান স্থান।

কাটোয়া জংশন হইতে **কৈচর** ১০ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া ৩ মাইল দূরবর্ত্তী পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামে যাইতে হয়। ক্ষীরগ্রামে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম যোগদ্যা, ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর ধরিয়া একটি দীঘির জলে ডুবানো থাকে। বৈশাখ-সংক্রান্তির দিন জল হইতে দেবীকে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করা হয় ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। যোগদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে একবার দেবী যোগাদ্যা একটি কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া জনৈক শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জলমধ্যে হইতে শঙখশোভিত হস্ত উত্তোলন করিয়া শাঁখারি ও স্থানীয় ধনী সেবাইতকে উহা দেখান। এই কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্তের একটি সুন্দর ইংরেজী কবিতা আছে। প্রবাদ পূর্ব্বে যোগদ্যার পূজার দিন প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একটি করিয়া নরবলি হইত।

কাটোয়া জংশন হইতে নিগন ১৩ মাইল দূর। এখানে নামিয়া ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম প্রাচীন স্থান **মঙ্গলকোটে** যাইতে হয়। মঙ্গলকোটে কয়েকজন মুসলমান ফকীরের সমাধি ও কয়েকটি পুরাতন মসজিদ আছে। এই ফকিরগণের মধ্যে পীর দানেশমন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার মৃত্যু তিথি বা উরস্ উপলক্ষে মঙ্গলকোটে মুসলমানদের একটি মেলা হয়। মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী **উজানি** গ্রাম শ্রীমন্ত সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। পূর্ব্বকালে এখানে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এখানে পীঠস্থানও আছে। উজানিতে সতীর দক্ষিণ কনুই পড়িয়াছিল, দেবীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা, ভৈরব কপিলাম্বর। সর্ব্বমঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডীর মূর্ত্তি পিত্তল নির্ম্মিত, দেবী দশভূজসমন্বিতা ও সিংহবাহিনী; কপিলাম্বর ভৈরব পলতোলা কষ্টি পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। উজানির মহাশ্মশানের এক পার্শ্বে খড়্গমোক্ষণ নামে একটি তীর্থ আছে। প্রবাদ, বেতালসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য জনৈক সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদ করায় তাঁহার হস্তে খড়্গ আবদ্ধ হইয়া যায়। বহু তীর্থ ভ্রমণের পর উজানির মহাশ্মশানে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে খড়্গ খসিয়া পড়ে। সেই হইতে এই স্থানের নাম হয় খড়্গমোক্ষণ তীর্থ। এখানে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা হয়। উজানিতে "ভ্রমরার দহ" ও "শ্রীমন্তডাঙ্গা" প্রভৃতি প্রাচীন স্থানও বিশেষ দ্রষ্টব্য। উজানির নিকটবর্ত্তী **কোগ্রাম** বিখ্যাত "চৈতন্য মঙ্গল"

প্রণেতা লোচন দাসের জন্মস্থান। লোচন দাসের সমাজ বা সমাধির আকৃতি ছোট পিরামিডের মত। এখানকার গৌর-নিতাইএর মন্দির বৈষ্ণবগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। "চৈতন্য মঙ্গল" ছাড়া লোচন দাস "আনন্দ লতিকা" ও "দুর্লভসার" নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাটোয়া হইতে আহম্মদপুরের দিকে কাটোয়া হইতে ১০ মাইল দূর নিরোল স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে **কেতুগ্রাম** একটি পীঠস্থান। এই স্থানের প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বাম পদ পতিত হইয়াছিল। দেবী বহুলা ও ভৈরব ভীরুক এখানে নিত্য পূজিত হন। কাটোয়া হইতে এই লাইনে বীরভূম জেলার অন্তর্গত **লাভপুর** স্টেশন ২৫ মাইল দূর। লাভপুরও একটি মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধঃওষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। দেবীর কোন বিগ্রহ নাই, প্রায় দশ বার হাত বিস্তৃত একখানি শিলাখণ্ড দেবীর ওষ্ঠরূপে পূজিত হয়। এই স্থানে তান্ত্রিকমতে শিবাভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার সময়ে "রূপী স্বপী" বলিয়া ডাকিলে বহু শৃগাল পালিত পশুর ন্যায় আহারের জন্য জঙ্গল হইতে আসিয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে দলদলি নামক একটি মজা দীঘি আছে। প্রবাদ রামচন্দ্র যখন অকালে দুর্গা পূজা করেন তখন এই দেবী দহ হইতেই নাকি নীলোৎপল লইয়াছিলেন। লাভপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী একঘর জমিদারের বাস। লাভপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দুবসো গোপালপুর নামে একটি গ্রাম আছে।প্রবাদ, এই স্থানে দুর্ব্বাসা ঋষির আশ্রম ছিল এবং ইহা হইতেই গ্রামের নাম দুবসো গোপালপুর হইয়াছে।

সালার—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৭৬ মাইল। স্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বদিকে কাগ্রাম পুরাতন কঙ্কগ্রাম নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পূর্ব্বকালে অজয় ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী ভভাগ কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে অভিহিত হইত। ইহারই প্রধান নগর কঙ্কগ্রাম চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং বর্ণিত কাজঙ্গল বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি এ অঞ্চলে অনেক মন্দির ও বিহার দেখিয়াছিলেন, এগুলি সম্ভবতঃ এখনও মাটির নীচে গুপ্ত হইয়া আছে।

মালিহাটী হলট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৭৮ মাইল। মালিহাটী বা মেলেটি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসের জন্মস্থান। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের বহরমপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে আর কেহ ছিলেন না। একবার ভক্ত বৈষ্ণব জয়পুররাজ জয়সিংহের সভায় বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত পশ্চিম দেশীয় বৈষ্ণবগণের পরকীয়া ও স্বকীয়া মত লইয়া বিচার হয়। গৌড়ীয়গণের পরাজয় ঘটিলে তাঁহারা এই বিচার বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের সহিত করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিতে অনুরোধ করেন। রাজা তখন বিচারে জয়ী স্বকীয়া মতাবলম্বী নিজ সভাসদ্ কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাংলায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শ্রীখণ্ড ও যাজিগ্রামে উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ রাধামোহনের সহিত বিচার প্রার্থনা করিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ এই বিচারের অনুমতি প্রদান করেন এবং নবদ্বীপ, ওড়িষ্যা বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ সভায় আগমন করেন। কৃষ্ণদেব রাধামোহনের নিকট পরাজিত হইয়া পরকীয়া মত অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গিয়া এই মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এই বিচার হইয়াছিল। ইহা ছাড়া রাধামোহনের নাম বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রাহক

হিসাবে স্মরণীয় থাকিবে। আউল মনোহর দাসের পদাবলীর প্রথম ও বিরাট সংগ্রহ "পদ সমুদ্রের" পর রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত সমুদ্র" সঙ্কলিত হয়; ইহার ৮৫২টি পদের মধ্যে ৪০০টি রাধামোহনের নিজের। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাধামোহন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহ "পদ কল্পতরু" সঙ্কলন করেন; ইহাতে ৩১০১টি পদ আছে। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস তাঁহার গুরু রাধামোহন ঠাকুরকে অদ্বৈতাচার্য্যের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়াছেন। পদাবলী সংগ্রহ গুলির মধ্যে পদকল্পতরুই সচরাচর ব্যবহারের পক্ষে প্রকৃষ্ট।

হালিশহর হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে ভরতপুর থানা, এই থানার অন্তর্গত কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হরিদাস আচার্য্যের জন্মস্থান। চৈতন্যদেবের তিরোভাবে হরিদাস অত্যন্ত আঘাত পান এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যু তিথিতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য কাঞ্চনগড়িয়ায় আসিয়া একটি বিরাট উৎসব সমাধান করিয়াছিলেন।

চিরতী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৯৪ মাইল। স্টেশন হইতে দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে রাঙ্গামাটি নামে একটি প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। নদীর অপর পারে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথে অবস্থিত বহরমপুর শহর এখান হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও রক্তাভ। গঙ্গার ভাঙ্গনে ইহার অধিকাংশ স্থান বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানে যে সকল উচ্চ ভূখণ্ড ও ঢিবি আছে তাহা ভগ্ন মৃৎপাত্র ও পুরাতন ইষ্টকাদির দ্বারা পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে এই স্থানের নিম্নে এক বিস্তৃত চর পড়িয়াছে এবং পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা প্রায় এক মাইল দূরে নূতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যৎকালে গঙ্গার ভাঙ্গনে রাঙ্গামাটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, গৃহের ছাদ ও খিলান ও নানাপ্রকার ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছিল। এককালে যে এখানে একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙের বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে য়ুয়ান্ চোয়াঙ কর্ণসুবর্ণ রাজধানীর নিকট "লো-টো-বী-চী" বা রক্তভিত্তি নামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে। "রক্তভিত্তি" বা "রক্তমৃত্তি" নাম হইতেই রাঙামাটি নাম হইয়াছে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। কর্ণসুবর্ণের সহিত রাঙামাটির সম্বন্ধের বা অভিন্নত্বের প্রমাণ স্বরূপ আরও বলা হয়, যে পূর্ব্বে এই স্থান কানসোণা নামেও অভিহিত হইত। কানসোণা নামটি যে কর্ণসুবর্ণ নামেরই অপভ্রংশ তাহা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। য়ুয়ান্ চোয়াং লিখিয়াছেন যে কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের পরিধি প্রায় তিনশত মাইল ও রাজধানী প্রায় চারি মাইল বিস্তৃত ছিল। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল এবং অধিবাসীরা অর্থশালী, বিদ্যানুরাগী ও ভদ্র-ব্যবহার সম্পন্ন ছিলেন। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যে ১০টি সঙ্ঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় দহাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তাহা ছাড়া দেবদত্ত সম্প্রদায়ের তিনটি সঙ্ঘারাম ছিল; তথায় দুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্য নিষিদ্ধ ছিল। এখানে নানা ধর্ম্মের লোক বাস করিতেন এবং ৫০টি হিন্দু মন্দির ছিল। রাজধানীর অন্তঃপাতী "রক্তমৃত্তি" বিহারে দেশ বিদেশ হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাবেশ হইত। এই সঙ্ঘারামের উচ্চ চূড়া রাত্রিকালে আলোক মণ্ডিত করা হইত। ইহা ছাড়া রাজধানীতে অশোক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি চৈত্যও য়ুয়ান্ চোয়াঙ দেখিয়াছিলেন। য়ুয়ান্ চোয়াঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মহারাজ শশাঙ্কের বহু পূর্ব্ব হইতেই রাঙ্গামাটি একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। য়ুয়ান

ভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির (পৃষ্ঠা ৮৭)
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]
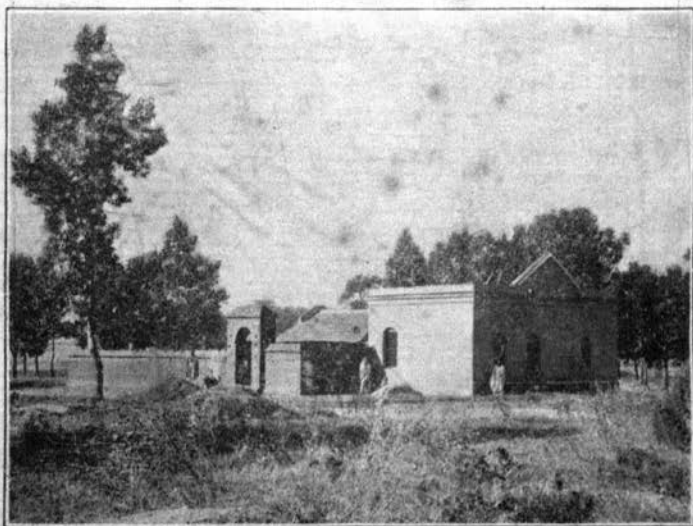
মধুপুর অঞ্চলের সাধারণ দৃশ্য (পৃষ্ঠা ৯০)

বৈদ্যনাথদেবের মন্দির (পৃষ্ঠা ৯০)
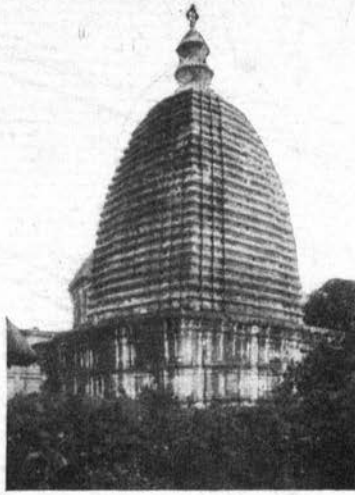
গোপীনাথ মন্দির, কুলীন গ্রাম (পৃষ্ঠা ৯২)

জলেশ্বর মন্দির, জৌগ্রাম (পৃষ্ঠা ৯৩)
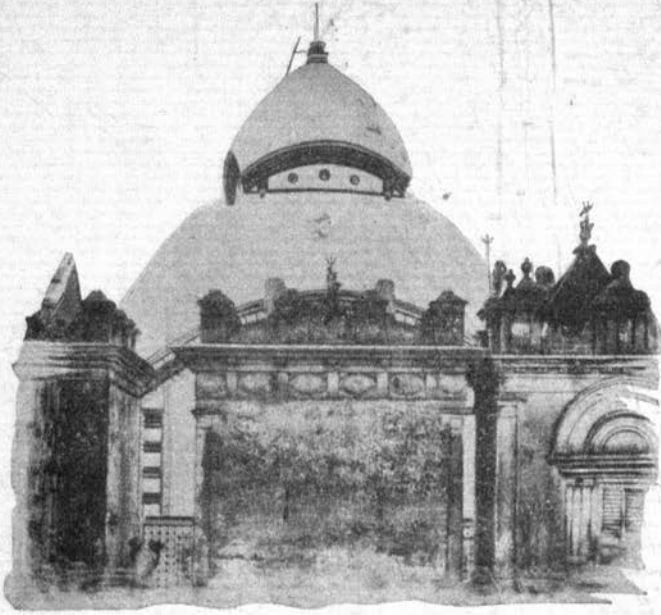
তারকেশ্বরের মন্দির (পৃষ্ঠা ৯৪)

হংসেশ্বরী মন্দির, বংশবাটী (পৃষ্ঠা ৯৬)

বাসুদেব মন্দির, বংশবাটী (পৃষ্ঠা ৯৬)

প্রাচীন ঘাট, ত্রিবেণী, (পৃষ্ঠা ৯৭)

বেণীমাধবের মন্দির, ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৯৭)

বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ৯৮)
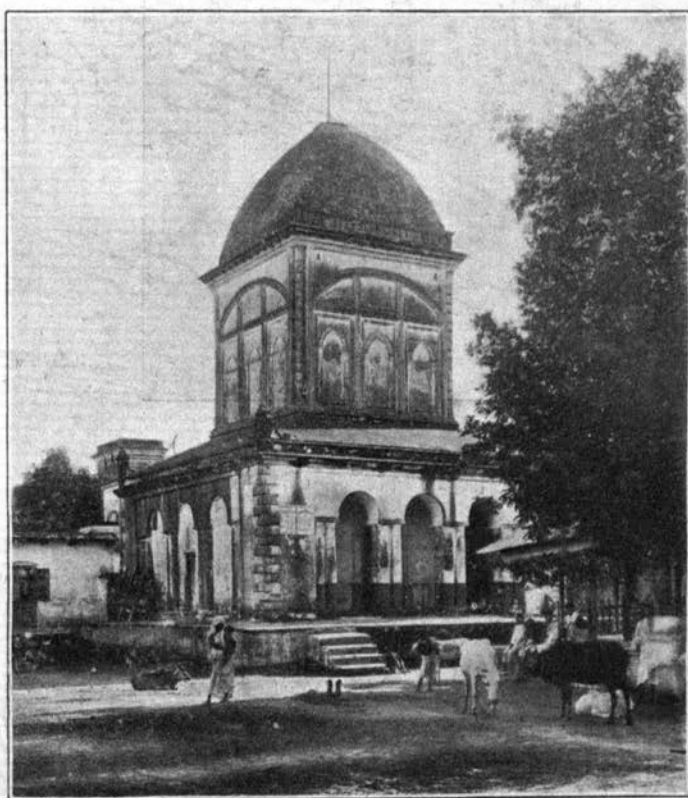
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

পোড়া মা তলা, নবদ্বীপ (পৃষ্ঠা ১০৪)

সর্ব্বমঙ্গলা, উজানি (পৃষ্ঠা ১১০)
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]
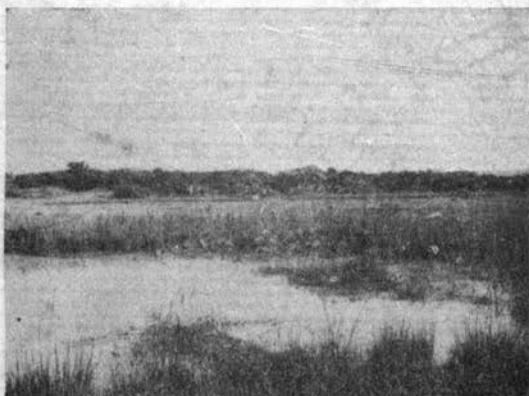
রাঙামাটীর ধ্বংসাবশেষ (পৃষ্ঠা ১১২)
[প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

চোয়াঙ লিখিয়াছেন যে রক্তমৃত্তি সজ্বারামের পার্শ্বে একটি অশোকস্তূপ ছিল এবং সেই স্থানে বুদ্ধদেব সপ্তাহকাল ধরিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই নগরীতে আরও কতকগুলি অশোক স্তূপও ছিল।

কর্ণসুবর্ণ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি, যে এই স্থানে দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র বৃষসেনের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাক্ষসরাজ বিভীষণ নিমন্ত্রিত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি শিশুর কল্যাণ কামনায় এই স্থানে স্বর্ণবৃষ্টি করায় ইহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণাভ হয় এবং তজ্জন্য উহার নাম কর্ণসুবর্ণ ও রাঙ্গামাটি হয়। এই স্থানের অদূরবর্ত্তী গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

রাঙ্গামাটির বেশীর ভাগ স্থানই গঙ্গাসাৎ হইয়াছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা, রাক্ষসী ডাঙ্গা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা নামক কতিপয় ডাঙ্গা বা উচ্চভূমি এখনও অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা নামক স্থানটিতে পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড শিবমন্দির ছিল বলিয়া কথিত। রাজবাড়ী ডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। রাক্ষসী ডাঙ্গাটি একটি ছোট পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ও অসংখ্য ইষ্টক ও প্রস্তরাদির দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার পাদমূলে অবস্থিত একটি বটবৃক্ষের নীচে একখানি পর্ণকুটিরের মধ্যে পীর তুর্কাণ সাহেব নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। প্রবাদ, রাক্ষসী ডাঙ্গায় এক রাক্ষসী বাস করিত। তাহার সহিত তর্ক করিবার জন্য রাজাকে প্রত্যহ একজন করিয়া পণ্ডিত পাঠাইতে হইত। পণ্ডিতেরা তর্কে পরাস্ত হইলে রাক্ষসী তাঁহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিত। অবশেষে পীর তুর্কান সাহেব রাক্ষসীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। পীর সাহেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থানে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। তাঁহার কবরে ইষ্টক সংযোগ করিবার আদেশ না থাকায় উহার উপর একখানি চালাঘর নিৰ্ম্মিত হয়। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সন্ন্যাসী ডাঙ্গা নামে একটি উচ্চ স্তূপ আছে। অনেকে অনুমান করেন রক্তমৃত্তি সজ্বারাম এই খানেই অবস্থিত ছিল। পীরপুকুর, যমুনা পুষ্করিণী প্রভৃতি নামধেয় কতকগুলি পুরাতন পুকুর রাঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনা পুষ্করিণী হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত ভগ্ন অষ্টভুজা মহিষ মর্দ্দিনী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ঐ মূর্ত্তিটি রাঙ্গামাটির রেশমকুঠির নিকট এক বট বৃক্ষতলে রক্ষিত আছে। দেবী প্রতিমার মুখ মণ্ডল ভগ্ন হওয়ায় দরুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পদতলস্থ মহিষটি সম্পূর্ণ অভগ্ন অবস্থায় আছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা যখন ভাঙ্গিয়া গঙ্গার মধ্যে পড়ে তখন উহা হইতে এক খানি স্বর্ণ প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। জনৈক লোক উহা পাইয়া আত্মসাৎ করে। প্রতিমাটি লক্ষ্মী প্রতিমা বলিয়া অনেকের অনুমান। কুষাণ ও গুপ্তযুগের বহুমুদ্রা এখানে পাওয়া গিয়াছে।

খাগড়াঘাট রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া বহরমপুরের শহরতলী খাগড়া বাজারে যাওয়া যায়। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের বহরমপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

খাগড়া ঘাট রোড স্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে তেলকর বিলের উপর অমরকুণ্ড গ্রামে গঙ্গাদিত্য নামে অশ্বারূঢ় একটি প্রাচীন সূর্য্য মূর্ত্তির মন্দির আছে। তেলকর বিল, পূর্ব্বে গঙ্গার খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সময়ে সম্ভবতঃ সূর্য্য মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গঙ্গাদিত্য নাম

প্রাপ্ত হয়। এই স্টেশন হইতে মোটরবাসযোগে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মহকুমা কান্দীতে যাইতে হয়। এই শাখা পথের চৌরীগাছা স্টেশন হইতে কান্দী ৮ মাইল পশ্চিমে। কান্দী শহর ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার পৌত্র লালাবাবু কান্দী শহরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের বাটী কান্দীর রাজবাটী নামে পরিচিত। গঙ্গাগোবিন্দ ওয়ারেন হেষ্টীংসের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। লালাবাবু সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে ধর্ম্ম সাধনায় কাটাইয়াছিলেন। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউ বিগ্রহ এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাসযাত্রার মেলার সময়ে এখানে মহাসমারোহ ও বহুলোকসমাগম হয়। কথিত আছে রাধাবল্লভ জীউর পূজাদির দৈনিক খরচ ৫০০৲ টাকা ছিল। কান্দীর দক্ষিণাকালীর মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজার পর চতুর্দ্দশী তিথিতে বিশেষ ধুমধাম হয়। কান্দীর রাজবংশীয়গণ অনেকদিন কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ায় বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজা নামে খ্যাত।

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত জেমো একটি পুরাতন পল্লী। স্বনামধন্য আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে রুদ্রদেব নামে এক শিব আছেন। এই শিব প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনেকের অভিমত। শিবরাত্রি ও চড়কের সময় এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

কান্দী হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত পাঁচথুপি একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এখানে কয়েক ঘর ধনী জমিদারের বাস। এই গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে "বারকোণার দোল" নামে একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। অনেকের মতে ইহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ। এই বিহারটিতে পাঁচটি স্তূপ ছিল বলিয়াই নাকি গ্রামের নাম পাচথুপি হইয়াছে।

লালবাগ কোর্ট রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১০৬ মাইল। এই স্থানে নামিয়া গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম মহকুমা লালবাগে যাইতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।

লালবাগ কোর্ট রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে কিরীটকণা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে দেবীর কিরীটের একটি কণা পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বিমলা বা কিরীটেশ্বরী, ভৈরব সম্বর্ত্ত। কিরীটকণা বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে সম্মানিত। ইহা পীঠস্থান বলিয়া পূজিত ; তবে কাহারও কাহারও মতে এখানে দেবীর অঙ্গ না পড়িয়া কিরীটের অংশ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহা একটি উপপীঠ। "তন্ত্রচূড়ামণি" ও "মহানীলতন্ত্র"এ কিরীটকণার উল্লেখ আছে। পাঠান ও মুঘলযুগে এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল নামক জনৈক বৈষ্ণবের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর মঙ্গল বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার চাঁদরা গ্রামে গিয়া বাস করেন ; তাঁহারই পৌত্র বদনচাঁদ ঠাকুর মনোহর সাহী সঙ্কীর্ত্তন রীতির প্রবর্ত্তক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করেন ও এই স্থানে কয়েকটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই স্থানে কালীসাগর নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার ঘাট বাঁধাইয়া দেন ও "কিরীটেশ্বরীর মেলা" নামে একটি মেলার প্রবর্ত্তন করেন। আজিও পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই স্থানে মেলা বসিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদে রাজধানী আসিবার পর

হইতে এই তীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। "সয়ের মুতক্ষরীণ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে নবাব জাফর আলি খাঁ বা মীরজাফর অন্তিমকালে শান্তি লাভের আশায় তাঁহার দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। নাটোরের সাধক রাজা রামকৃষ্ণ নিকটস্থ বড়নগর হইতে এখানে প্রায়ই আসিতেন এবং সাধন ভজনে মগ্ন থাকিতেন; এখনও দুইখানি প্রস্তরখণ্ড তাঁহার আসন বলিয়া পরিচিত আছে। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়ার পর কিরীটেশ্বরীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে লালগোলার মহারাজ; বহু অর্থব্যয়ে কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। কিরীটেশ্বরীর মন্দির পশ্চিমদ্বারী মন্দির মধ্যে কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। কেবল একটি উচ্চ প্রস্তরবেদী আছে। উচ্চ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী আছে, উহাই দেবীর কিরীটরূপে পূজিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবার তোরণের দুই দিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে দক্ষিণ দিকের মন্দিরটি রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। নিকটেই আর একটি প্রাচীন মন্দিরে এক বৃহৎকায় বিদীর্ণ শিবলিঙ্গ অবস্থিত। উহাও রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। প্রবাদ যে রাজা রাজবল্লভের পুত্র নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলে এই শিবলিঙ্গ আপনা হইতে বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলিয়া যে মূর্ত্তির পূজা করা হয় উহা প্রকৃত পক্ষে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। গ্রামের মধ্যে গুপ্তমঠ নামে আর একটি নূতন মন্দিরেও কিরীটেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা আছে। পুরাতন মন্দির হইতে পূজারীরা দেবীর কিরীট এই নূতন মন্দিরে লইয়া আসিয়াছেন; উহা সর্ব্বদা লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে এবং দেখিতে নিষেধ।

আজিমগঞ্জ জংশন—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১১০ মাইল দূর। ইহা একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এই স্থানে দুধোরিয়া ও নওলাক্ষা উপাধিধারী দুইটি ধনী জমিদার বংশের বাস। বাংলা দেশের মধ্যে আজিমগঞ্জ ও গঙ্গার পূর্ব্বপারে স্থিত জিয়াগঞ্জে বহু জৈন বণিকের বসতি আছে। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের সময় এই সকল পশ্চিমদেশীয় বণিক বাংলায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আজিমগঞ্জে অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। এখানকার বিখ্যাত ধনী ধনপৎ সিং নওলাক্ষার "গোলাপবাগ" নামক মনোরম উদ্যানবাটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু আজিমগঞ্জ এককালে মুর্শিদাবাদের শহরতলী বলিয়া গণ্য হইত। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উস্-সাণের নাম হইতে এই শহরের নাম আজিমগঞ্জ হয়।

আজিমগঞ্জের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বড়নগর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে নাটোর রাজবংশের "গঙ্গাবাস" ছিল। বড়নগর মন্দিরে পরিপূর্ণ এই স্থানে রাণী ভবানীর অনেক পুণ্যকীর্ত্তি আছে। ভবানীশ্বর শিবের মন্দির বড়নগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বাংলা দেশে ইহার মত উচ্চ মন্দির অল্পই আছে। ইহার চারিদিকে বারান্দা ও আটটি প্রবেশ পথ আছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। বারাণসী ধামেও রাণী ভবানী স্থাপিত ভবানীশ্বর আছেন; কথিত আছে দুইটি মন্দির একই কালে স্থাপিত। রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর স্থাপিত গোপাল মন্দির ও ভবানীর প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী দশভুজা অন্নপূর্ণারূপিনী রাজরাজেশ্বরীর মন্দির, মদনগোপালের মন্দির ও চারি বাংলার মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। মদনগোপালের মন্দিরটি বড়নগরের আদি রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নবাব মুর্শিদ কুলীর সহিত বিবাদের ফলে উদয়নারায়ণ বড়নগর ত্যাগ করিয়া গিয়া বীরকিটিতে বাস করেন। তথায় নবাবের সহিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ও পতন হইলে বড়নগর নাটোরের জমিদারীভুক্ত হয়। রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত

চারি বাংলার মন্দিরের প্রত্যেক খানি ইষ্টকের গাত্রে অতিসুন্দর কারুকার্য্যময় পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। চারিদিকে চারিটি বাংলা ধরণের শিবমন্দির পরস্পর সংলগ্ন হইয়া চারিবাংলার মন্দির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। চারি বাংলা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বড়নগরেই রাণী ভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র সাধক রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন এই স্থানে দৃষ্ট হয়। বড়নগরের অষ্টভূজ গণেশের মন্দির, রাণী ভবানীর গুরু বংশীয়দের মঠবাড়ী, ব্রহ্মানন্দ নামক সন্ন্যাসী প্রতিষ্ঠিত দয়াময়ী বাড়ীর অতি সুন্দর পাথরের কালী মূর্ত্তি প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বড়নগর এ অঞ্চলের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। বড়নগরের ঘড়া বাংলার সর্ব্বত্র আদৃত ছিল। বহরমপুর খাগড়ার অধিকাংশ বাসন-নির্ম্মাতা বড়নগর হইতে আগত।

আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত গয়সাবাদ একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বহু ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। আজিমগঞ্জের পরের স্টেশনে মহীপাল হল্ট্ হইতে গয়সাবাদ ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন মহীপাল নগরীর অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। পাঠান রাজত্বকালে গয়সাবাদ একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। প্রবাদ বঙ্গেশ্বর গিয়াস-উদ্-দীন কর্ত্তৃক এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। গৌড়ে গিয়াস উদ্দীন নামে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রথম গিয়াস্ উদ্দীনের সময়ে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাচীন মহীপাল নগরীর প্রস্তরাদি লইয়া নগরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি দরগাহ আছে, উহার মধ্যে চারিটি সমাধি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সমাধিটি জনৈক ফকীরের সমাধি বলিয়া পরিচিত। দরগাহের সোপান-গুলি প্রাচীন মহীপাল নগরীর প্রস্তর লইয়া নির্ম্মিত। ইহার নিকট পালি ভাষায় খোদিত দুইটি প্রস্তর খণ্ড ও কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। গয়সাবাদে নশীপুর রাজবংশের নির্ম্মিত একটি উচ্চ তুলসী বিহার মন্দির আছে। বর্ত্তমানে এখানে কোন উৎসব হয় না। মন্দিরটির এখন ভগ্নদশা।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন সাহেবগঞ্জ লুপ শাখায় অবস্থিত বীরভূম জেলার বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস নলহাটি জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে সাগরদীঘি, মোরগ্রাম ও লোহাপুর উল্লেখযোগ্য স্থান।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে সাগরদীঘি স্টেশন ৯ মাইল দূর। স্টেশন হইতে সাগরদীঘির দূরত্ব প্রায় এক মাইল। দীঘিটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। কথিত আছে, যে এই দীঘি খুব গভীর করিয়া খনন করা সত্ত্বেও উহাতে জল উঠে নাই। অতঃপর রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে সাগর নামক জনৈক কুম্ভকার যদি দীঘির মধ্য হইতে এক কোদালী মাটি তুলিয়া ফেলে, তবেই জল উঠিবে। রাজার আদেশে সাগর এক কোদালী মাটি তুলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীঘি জলে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। সাগরের নাম হইতেই দীঘির নাম হয় সাগরদীঘি। স্থানীয় লোকেরা এই দীঘির জল ব্যবহার করে না বা ইহাতে মাছ ধরে না। তাহারা এই দীঘিটিকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে। সাগর দীঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকার কাহিনীও প্রচলিত আছে। এক সময়ে রাজা মহীপাল তাঁহার পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরে যাইবার পথে এখানে শিবির সন্নিবেশ করেন। রাজসৈন্য ও কর্ম্মচারিগণকে দেখিয়া স্থানীয় দুইটি ব্রাহ্মণ বালক বিশেষ ভয় পাইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করে। উহাদের মধ্যে একজন এতদূর ভয় পায় যে সে বৃক্ষশাখায় প্রাণত্যাগ করে।

হাতে কলমে শিক্ষা, শ্রীনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

মুক্তবায়ুতে অধ্যাপনা, শান্তিনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

নলহাটির দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১২৬)

হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী,
কুলীনগ্রাম (পৃষ্ঠা ৯২)

এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে তাঁহারই জন্য ব্রহ্মহত্যা ঘটিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দেন যে রাজা ও রাণী যতদূর পর্য্যন্ত একসঙ্গে পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন ততদূর পর্যন্ত একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত চলিবার পর রাণী ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। সুতরাং সাগরদীঘির দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত হয়। সাগরদীঘি পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পারে তিনটি করিয়া ছয়টি এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম পারে দুইটি করিয়া চারিটি, মোট দশটি বাঁধাঘাট ছিল। ঘাটগুলির চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। এই দীঘির তীরে একখানি প্রস্তরফলকে একটি শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল, উহা হইতে জানা যায় যে পালবংশীয় রাজা ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষালনের জন্য ৭৪০ শকে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দীঘি খনন করিতে ১০ হাজার কুলী, ৬ হাজার খনক, ১০ লক্ষ ইট ও ২ লক্ষ করিয়া তৃণ ও কাষ্ঠ লাগিয়াছিল এবং শত সহস্র গরু, অসংখ্য শীতবস্ত্র, ধৌতবস্ত্র, সুবর্ণ ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় রাজা মহীপাল এই দীঘির প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশীয়গণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল। সাগরদীঘির পশ্চিমে লস্করদীঘি নামে আর একটি ক্ষুদ্র দীঘি আছে। সাগর দীঘি ষ্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে গুড়ে ও পশলা নামে দুইটি গ্রামের নিকট দিয়া যে প্রকাণ্ড বিলটি দক্ষিণদিকে গিয়াছে তাহার নাম "বসিয়ে" বা বশিষ্ঠ বিল। এই বিলের কিয়দংশ "বশিষ্ঠ কুণ্ড" নামে অভিহিত এবং তথায় বশিষ্ঠদেবের পূজা হয়। গ্রীষ্মকালে জল শুকাইলে এই বিলের স্থানে স্থানে শীতল জলের উৎস বাহির হয়।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে **মোরগ্রাম** ষ্টেশন ১৬ মাইল দূর। মোরগ্রামের ১৬ মাইল দক্ষিণে খড়গ্রাম থানা পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। খড়গ্রাম হইতে ৬ মাইল উত্তরে শেরপুর ও ৩ মাইল উত্তরে আতাই গ্রাম। মহারাজ মানসিংহের সহিত পাঠান বিদ্রোহিগণের শেরপুর আতাইএর যুদ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলার একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর দায়ুদ খাঁর মৃত্যুর পর গৌড় রাজত্ব মুঘল অধিকারে আসিলেও অল্পকাল মধ্যে পাঠানগণ কতলুখাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া ওড়িষ্যা জয় করেন। কতলুখাঁর মৃত্যুর পর ওড়িষ্যা পুনরায় মুঘলদিগের অধিকারে আসে; কিন্তু মহারাজ মানসিংহ বাংলা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে বাহির হইলে পাঠাণগণ কতলুখাঁর পুত্র উস্‌মানের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হন। মহারাজ মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় বাংলায় আসিতে হয়। শেরপুর ও আতাইএর মধ্যে অবস্থিত মরিচা বা মুর্চা নামক স্থানে উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধ হয়; রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন অনুসারে ২০ হাজার পাঠান সৈন্য এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। মানসিংহ এইবার পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। যুদ্ধজয়ের জন্য মহারাজ মানসিংহ সম্রাট্ আকবরের নিকট হইতে সাত-হাজারী-মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন। মরিচার যুদ্ধপ্রান্তর এখনও গড়ের মাঠ নামে খ্যাত। আতাইএর গড়ের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। আতাই গ্রামে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের সমাধি স্থান লোকের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। আতাইএর পার্শ্বস্থ নগর গ্রামে দাদাপীর নামক এক প্রসিদ্ধ ফকিরের আস্তানা আছে। প্রবাদ গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ তাঁহার নানারূপ অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিয়া রূপ ও সনাতন সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, একবার এক ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দাদাপীর দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাধা দেন এবং নিজের শিষ্য করিয়া লন; তদবধি সেই ব্রাহ্মণ শাহ মুরাদ নামে খ্যাত হন। তাঁহার সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে তিনি দাদাপীরের খাদ্য প্রস্তুত করিতেন এবং একবার অবিশ্রান্ত বর্ষার দুর্য্যোগে কাঠ না পাইয়া উনানের মধ্যে নিজের একখানি

পা ঢুকাইয়া দেন। দাদাপীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং নির্দ্দেশ দান করেন যে তাঁহাদের মৃত্যুর পর প্রথম দিন শাহ্ মুরাদের এবং পরদিন তাঁহার নিজের ফতেহা হইবে। এখনও প্রতি বৎসর পৌষ মাসের ১৯এ শাহ্ মুরাদের এবং ২০এ দাদাপীরের ফতেহা বা মৃত্যু-উৎসব পালিত হয়; এই সময়ে নগর গ্রামে একটি বড় মেলা হয়।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে লোহাপুর ১৮ মাইল দূর। এই স্টেশনের উত্তরে গম্ভীরা নদীর তীরে বারা বা বালানগর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা বাণরাজা, মতান্তরে বালা রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত। আরও কিংবদন্তী আছে যে বারা ও তাহার নিকটবর্ত্তী বাণেশ্বর ও নগর এই তিনটি গ্রাম লইয়া মহাভারতের বর্ণিত বারণাবত নগর ছিল। পাণ্ডবগণ কিছুকাল এই অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত এবং এই স্থানেই নাকি জতুগৃহ দাহ হয়। স্টেশনের ৪ মাইল দক্ষিণে ভদ্রপুর গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দ কুমারের জন্মস্থান। তাঁহার বসত বাটী ও তাঁহার খনিত রাণী সাগর ও গুরু সাগর দীঘি এখনও বর্ত্তমান।

মহীপাল হল্ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১১৭ মাইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর রাঢ়ে মহীপাল নামে এক পাল বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন এবং মহীপাল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি প্রসিদ্ধ পাল বংশীয় রাজা মহীপাল হইতে ভিন্নব্যক্তি; সম্ভবতঃ ইনি গৌড়াধিপতি পালবংশের অপর কোন শাখা-সম্ভূত। এই স্থানে মহীপাল নগরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। মহীপাল নগর প্রায় ৭।৮ মাইল বিস্তৃত ছিল; আজিমগঞ্জ নলহাটি শাখার বাড়ালা স্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথী কূলে গয়সাবাদ পর্য্যন্ত মহীপাল নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উক্ত শাখা লাইনে মহীপাল খনিত সাগর দীঘির কথা কিছু আগে বলা হইয়াছে। যে স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল উহাই এখন মহীপাল নামে পরিচিত; প্রাসাদটি এখন ভগ্নস্তূপ মাত্র; ইহার মধ্যে দুইটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। ভগ্নস্তূপের নিকট বহু প্রস্তর খণ্ড দৃষ্ট হয়; একটি অস্বাভাবিক প্রস্তর মূর্ত্তিকে লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া থাকে; ইহার আকৃতি হস্তীর ন্যায়, কিন্তু দুইটি শিংও আছে; অনেকে অনুমান করেন ইহা কোনও বৌদ্ধ মন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তি হইবে। মহীপালের নিকটস্থ একটি প্রাচীন জলাশয় হইতে একটি দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট বিরাট দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল; মূর্ত্তিটি এখন কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে; ইহার দুই পাশে দুইটি দণ্ডায়মান সহচর ও তাহাদের পাশে দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি বসিয়া আছে। ইহা হিন্দু কি বৌদ্ধমূর্ত্তি তাহা ঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

মণিগ্রাম—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১২৩ মাইল; স্টেশনের প্রায় একমাইল উত্তরে চাঁদপাড়া বা একআনা চাঁদপাড়া গ্রাম। সাগরদীঘি রেল স্টেশন হইতে এই গ্রাম প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ বাল্য কালে এই গ্রামের জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কার্য্য করিতেন। প্রবাদ, হুসেন তাঁহার পিতার সহিত আরব হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। কথিত আছে একদিন হুসেন সুবুদ্ধি রায়ের গরু চরাইতে গিয়া মাঠে ঘুমাইয়া পড়িলে দুইটি সাপ আসিয়া রৌদ্র হইতে তাঁহার মাথা ঢাকিয়া রাখে। সুবুদ্ধি রায় ইহা দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি রাজা হইবেন এবং তখন যেন পুরাতন মনিবকে ভুলিয়া না যান। চাঁদপাড়ায় থাকা কালীন গ্রামের কাজীর কন্যার সহিত হুসেনের বিবাহ হয়। কাজীর বাড়ীতে তিনি লেখা পড়া শিখেন, এবং কাজীর গৌড় দরবারে যাতায়াত থাকায় তাঁহার সাহায্যে হুসেন রাজ

দরবারে একটি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই উজির পদে উন্নীত হন। উত্তরকালে বাদশাহ হইয়া তিনি সুবুদ্ধি রায়কে এই গ্রাম নিষ্কর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সুবদ্ধি রায় মুসলমান বাদশাহের দান গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় হুসেন শাহ এই গ্রামের খাজনা মাত্র এক আনা ধার্য্য করেন। তদবধি গ্রামের নাম হয় একআনা-চাঁদপাড়া। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে সুবুদ্ধি রায় একবার একটি পুষ্করিণী খনন করাইবার সময় হুসেনকে উহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে হুসেনের অবহেলা দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুকের দ্বারা আঘাত করেন। এই আঘাতের চিহ্ন তাঁহার দেহে চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়। উত্তরকালে হুসেন বাদশাহ হইলে তাঁহার বেগম এই চিহ্ন দেখিয়া এবং উহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশের জন্য হুসেনকে উত্তেজিত করেন। কিন্তু ধীরবুদ্ধি হুসেন শাহ তাঁহার বাল্যকালের প্রতিপালক ও অন্নদাতার প্রাণনাশে অস্বীকৃত হন। ইহাতে বেগম তাঁহার জাতি নাশ করিবার জন্য হুসেনকে অনুরোধ করেন। কৃতজ্ঞ হুসেন তাহাতেও সম্মত না হইলে স্বয়ং বেগম সাহেবা সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে উদ্যতা হইলে অনন্যোপায় হুসেন অগত্যা করোয়া হইতে জল লইয়া সুবুদ্ধি রায়ের মুখে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া সুবুদ্ধি রায় বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথাকার পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তপ্ত ঘৃতপানে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। সুবুদ্ধি রায় কাশীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার পরামর্শ মত বৃন্দাবনে গমন ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপে আত্মনিয়োগ করেন। সুবুদ্ধি রায় যে দীঘি খননের কার্য্যে হুসেন শাহকে নিযুক্ত করেন, চাঁদপাড়ায় অদ্যাপি লোকে তাহা দেখাইয়া থাকে। ইহার নিকটেই সুবুদ্ধি রায়ের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; ইহা চাঁদরায়ের ভিটা বলিয়া পরিচিত।

মণিগ্রাম স্টেশন হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে নশীপুর ও পানিশালা গ্রাম। ইহাদের নিকটস্থ রেয়াপুরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত নরহরিদাস চক্রবর্ত্তী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার অপর নাম ঘনশ্যাম দাস। তিনি ভাল ভোগ রাঁধিতে পারিতেন বলিয়া রসুয়া নরহরি নামে অভিহিত হইতেন। তৎকৃত বিরাট গ্রন্থ "ভক্তিরত্নাকর" ও "নরোত্তম-বিলাস" বৈষ্ণব সমাজে আদৃত। সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্র অবলম্বনে বাংলায় "ছন্দ সমুদ্র" নামে একখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেন।

গণকর—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১২৮ মাইল। স্টেশনের নিকটে বৌদ্ধযুগের বলিয়া অনুমিত ভীমের গদা নামে প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। স্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আজিমগঞ্জ নলহাটি শাখার মোরগ্রাম স্টেশনের ৫ মাইল উত্তরে জঙ্গীপুর রোড নামক রাজ পথের পার্শ্বে "শেখের দীঘি" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগর দীঘি ও মহেশালের দীঘির পর এত বড় দীঘি আর নাই। দীঘির পার্শ্বস্থ গ্রামটিও শেখের দীঘি নামে পরিচিত। দীঘির পশ্চিম তীরে একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে গৌড়রাজ হুসেন শাহ্ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। শেখের দীঘির ধারে আবু সৈয়দ ত্রিমিজ নামক একজন ফকিরের সমাধি আছে। ইহার নানারূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ। কথিত আছে, দীঘি খননের পর জল বাহির না হইলে হুসেন শাহের অনুরোধে ফকিরের আদেশ মত তাঁহার এক চেলা তাঁহার নিকট হইতে একটি দণ্ড লইয়া দীঘির গর্ভে পুতিলে জল বাহির হয়।

জঙ্গীপুর রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৩২ মাইল দূর। এখানে নামিয়া মুর্শিদাবাদের অন্যতম মহকুমা দুই মাইল পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত জঙ্গীপুরে যাইতে হয়। জঙ্গীপুরের বিপরীতদিকে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জ নামক স্থানে জঙ্গীপুরের মহকুমা-আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। কিংবদন্তী অনুসারে স্থানটি সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার নামের অপভ্রংশ হইতে ইহার নাম জঙ্গীপুর হইয়াছে। জঙ্গীপুরে প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তুলসী বিহার মেলা হয়।

ইংরেজ যুগের প্রথম আমলে এখানে ইংরেজদের রেশমের একটি বড় কুঠি ছিল। শহরের বালিঘাটা পাড়াটি মহাকবি বাল্মীকির নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। নদীর ধারে একটি প্রাচীন বটগাছ দেখাইয়া লোকে বলে ঐ স্থানে কবি স্নান করিতেন।

জঙ্গীপুরে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ আছে, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ কাসিম কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন তাঁহার নাম হইতেই কাশীম-বাজার শহরের নামকরণ হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ নামে একজন মুসলমান ফকীর জঙ্গীপুরে বাস করিতেন। জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বেরিলী জেলায় তাহার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পিতা সৈয়দ হাসেন কাদেরী একজন ফকীর ছিলেন। মর্ত্তুজা বাল্যকাল হইতেই জঙ্গীপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাস করিতেন। তিনি অতি অল্প বয়সে ফকীর হন ও ঈশ্বর উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। জঙ্গীপুরের দুই মাইল দক্ষিণে চড়কা গ্রামের রাজাক সাহেব তাঁহার গুরু ছিলেন। মর্ত্তুজা সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে এক আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। এই শাখার খিদিরপুর হল্ট স্টেশন দ্রষ্টব্য। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে এই স্থানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি মুসলমান ফকীর হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন বলিয়া তিনি মর্ত্তুজা হিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। আনন্দময়ী নামে এক ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহার ভৈরবী বা সাধন-সহচরী ছিলেন। এজন্যে উভয়ে মর্ত্তুজানন্দ নামে অভিহিত হইতেন। মর্ত্তুজার কবরের পার্শ্বে আনন্দময়ীর সমাধি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মর্ত্তুজা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পশ্চিম দেশীয় মুসলমান হইয়াও তিনি সুললিত ও মধুর বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি বৈষ্ণবপদাবলী পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার একটি পদের কিছু অংশ প্রদত্ত হইল,

মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি॥

মুসলমান, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সকলে তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভক্তি করিত। ছাপঘাটিতে তাহার দরগাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পুজিত হয়। প্রতি বৎসর রজব মাসে তথায় একটি মেলা বসে এবং বহু ফকীর ও গৃহী আসিয়া সমাধি দুটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মর্ত্তুজার স্ত্রীর নাম ছিল নিজাম বিবি এবং তাঁহাদের চারি পুত্র ও দুই কন্যা লাভ হয়; তাঁহার এক কন্যার সহিত জঙ্গীপুরের প্রাচীন মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ কাসিমের বিবাহ হয়। সৈয়দ মর্ত্তুজার বংশ বিদ্যমান আছে।

জঙ্গীপুর শহর হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে গিরিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। ইহার চারিপাশে নদীর উভয় কূলে প্রায় ৮।১০ মাইল ব্যাপী প্রান্তর গিরিয়ার প্রান্তর নামে অভিহিত। ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রান্তরের অংশকে সূতীর ময়দানও বলা হয়; গিরিয়ার ৬ মাইল উত্তরে সূতী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই গিরিয়ার প্রান্তর দুইবার সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ ও তাঁহার বিহারের সুবাদার বিদ্রোহী আলিবর্দ্দী খাঁর মধ্যে গিরিয়া গ্রামের নিকটে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন। পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য। নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুরক্ত সেনাপতি গওস খাঁ তাঁহার দুই পত্রের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। আলিবর্দ্দী খাঁ সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। গওস খাঁর বীরত্ব ও প্রভুভক্তি এ অঞ্চলে গ্রাম্য গাথায় স্থান পাইয়াছে। যে স্থানে গওস খাঁ নিহত হন তথায় একটি দরগাহ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল; পরে তাঁহার গুরু ফকির শাহ্ হায়দরী তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃতদেহ ভাগলপুরে লইয়া গিয়া পুনরায় সমাহিত করেন। গিরিয়ার আদি দরগাহটি ভাগীরথী গর্ভে যাইলে, নদীর পশ্চিম কূলে চাঁদপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র দরগাহ্ নির্ম্মিত হয়; উহা এ অঞ্চলের মুসলমানগণের বিশেষ শ্রদ্ধার স্থল। এই যুদ্ধে গওস খাঁর পতনের পরই নবাব সরফরাজ খাঁর রাজপুত জাতীয় সেনাপতি বিজয় সিংহ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন; তাঁহার সহিত তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল; বালক পিতার মৃতদেহ রক্ষার্থে তরবারী হস্তে জয়োন্মত্ত শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বীরদর্পে তাহাদের আটকাইয়া রাখিল যাহাতে পিতার মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিতে না পারে। রিয়াজ-উস-সলাতীনে লিখিত আছে যে আলিবর্দ্দী খাঁ বালকের এইরূপ দুর্ব্বার সাহসে মুগ্ধ হইয়া নিজ হিন্দু সেনাগণের সাহায্যে বিজয় সিংহের মৃতদেহের শাস্ত্রমত সংকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর কয়েকটি গোলন্দাজ সৈন্য বালককে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিয়াছিল। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া গিরিয়া গ্রামের এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মিঠিপুর গ্রাম হইতে পূর্ব্বদিকে খামরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিরিয়া-প্রান্তরের অংশটি আজও "জালিম সিংহের মাঠ" নামে পরিচিত।

গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশলই নদীর সঙ্গমের নিকট নবাব মীর কাসিম ও ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাসে সংঘটিত হয়। ইহা সূতীর যুদ্ধ নামেও অভিহিত হয়। মুর্শিদাবাদে মোতিঝিলের নিকট মীর কাসিমের সৈন্যদল পরাজিত হইয়া মীর কাসিম প্রেরিত সসৈন্য সেনাপতি সমরু, মার্কার, আসাদ উল্লা প্রভৃতির সহিত সূতীর নিকটে মিলিত হন। মেজর আডামসের অধীনে ইংরেজগণ ভাগীরথী পার হইয়া উত্তরে আগাইয়া যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মীর কাসিমের সেনাদল পরাজিত হইয়া রাজমহলের নিকট উধুয়ানালায় পলায়ন করিয়া শিবির স্থাপন করেন। তথায় ইংরেজ সৈন্য শিবির আক্রমণ করিয়া নবাব পক্ষকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

বিভারিজ সাহেব গিরিয়া প্রান্তরকে মুর্শিদাবাদের পাণিপথ বলিয়াছেন। রাজধানী দিল্লীর অনতিদূরে পাণিপথে যেরূপ মুঘল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তির পরাভব ঘটে, গিরিয়ার রণ ক্ষেত্রে সেইরূপ আলিবর্দ্দী খাঁর অভ্যুদয় ও মীর কাসিমের পরাভব ঘটে।

খিদিরপুর হল্ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৪১ মাইল। স্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে মহেশাল গ্রামে প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে; ইহার নিকট

গৌড়পতি হুসেন শাহের জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী বলিয়া কথিত রাজা মঙ্গল সেনের বাটির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; এই স্থান হইতে হুসেন শাহের রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মহেশাল হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে জীয়ৎকুঁড়ি গ্রাম, এই স্থানের একটি অতি প্রাচীন জলাশয়ের নাম "জীবৎকুণ্ড"। এই জলাশয়ের নাম হইতেই গ্রামের নাম জীয়ৎকুণ্ড বা জীয়ৎকুঁড়ি হইয়াছে। এই জলাশয়ের চতুঃপার্শ্বে অনেক ইষ্টকস্তূপ ও দেবদেবীর ভগ্নমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। জলাশয়টির মধ্যে একটি অর্দ্ধ প্রোথিত দেবমূর্ত্তি কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া অভিহিত হন। জীয়ৎকুঁড়ি গ্রামটি যে এককালে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ কথিত আছে যে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের অধীশ্বর তখন এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী ব্রাহ্মণ জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার এক তিওর জাতীয় ভৃত্য ছিল। ভৃত্যটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল এবং জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে অনেক সময়ে প্রভুকে পরামর্শ প্রদান করিত। উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার নিঃসন্তান ছিলেন। সস্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবার সময় তিনি তিওর-ভৃত্যকে জমিদারী পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া যান। ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে ভৃত্য রটাইয়া দেয় যে তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে এবং দানসূত্রে সেই এখন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তীর্থকৃত্য করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভৃত্যকে ডাকিয়া সম্পত্তি পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে উত্তর দিল, "প্রভু, আপনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার সময় আমার নিকট সম্পত্তি ন্যাস রাখার সাক্ষ্যস্বরূপ চর্ব্বিত তাম্বুল রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদি ফিরাইয়া লইতে হয় উহাশুদ্ধই লউন।" প্রবাদ, এই কথার পর ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক সেই স্থান চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ব্রাহ্মণের বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভে তিওরের মনে দম্ভের সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে "রাজা" বলিয়া প্রচার করে ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। তাহার দমনের জন্য হুসেন শাহ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তিওররাজকে তাহারা পরাজিত করিতে অসমর্থ হয়। প্রবাদ, যে নিকটস্থ একটি কুণ্ডের জলস্পর্শে মৃত তিওর সৈন্যগণ পুনর্জীবন লাভ করায় বাদশাহী ফৌজ তাহাদিগের সহিত আটিয়া উঠিতে পারে না। এই কুণ্ডই "জীয়ৎকুণ্ড" নামে খ্যাত। অবশেষে মুসলমান সেনাপতি গোরক্তের দ্বারা কুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দিলে উহার সঞ্জীবনী শক্তি লোপ পায় এবং তিওররাজের পতন ঘটে। কথিত আছে যে তিওররাজ কুণ্ডের সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পাতালে গিয়া এখনও অবস্থান করিতেছেন।

খিদিরপুর হল্ট্ স্টেশনের এক মাইলের কিছু অধিক পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সুতী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সুতীর নিকটেই গঙ্গার প্রধান ধারা হইতে ভাগীরথী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুতীর পার্শ্বে বাজিতপুর গ্রামে সর্ব্বেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে একটি যুদ্ধের ছবি অঙ্কিত আছে; প্রবাদ ইহা সুতীর যুদ্ধের (গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের) স্মরণে অঙ্কিত।

সুতীর নিকট ছাপঘাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ ফকির সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ ও আনন্দময়ীর সমাধি এ অঞ্চলের সকলেরই দ্রষ্টব্য। জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের প্রসঙ্গে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে।

ধুলিয়ান্ গ্যান্জেস—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৪৯ মাইল দূর। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলার শেষ স্টেশন। ইহার নিকট দিয়া ভাগীরথী ও পদ্মা এই উভয় নদী প্রবাহিত। ইহা একটি উন্নতিশীল বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানকার তালা ও জাঁতি অতি উৎকৃষ্ট। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

(ঘ) খানা জংশন—সাঁইথিয়া—নলহাটি—বারহাড়োয়া (সাহেবগঞ্জ লুপ শাখা)

গুস্‌করা—খানা জংশন হইতে ১২ মাইল দূর। ইহা বৰ্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে ধান্য ও চাউলের খুব বড় কারবার আছে। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে এখানে খুব বড় হাট হয় এবং ঐ হাটে ধান্য ও চাউল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বহু দূর হইতে লোক আসে। এখান হইতে ৭ মাইল দূরে মাহত গ্রাম পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য খ্যাত ছিল। মাঘ মাসে এখানে গোবিন্দ জীউর মন্দিরে একটি মেলা বসে।

বোলপুর—খানা জংশন হইতে ২৪ এবং হাওড়া হইতে ৯৯ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম শান্তি-নিকেতনের জন্য বোলপুরের নাম জগৎবিখ্যাত হইয়াছে। বোলপুর স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে এই আশ্রম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান অনুর্ব্বর প্রান্তর ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই স্থানের নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এখানকার একখণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং তথায় একটি মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বর আরাধনার জন্য উৎসর্গ করেন। কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা বা আমিষ আহার এই আশ্রমে নিষিদ্ধ। মহর্ষি যে দুইটি ছাতিম (সপ্তপর্ণ) গাছের তলায় ধ্যান ও আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। একটি মর্ম্মর প্রস্তরে মহর্ষির নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উৎকীর্ণ আছে,

"তিনি
আমার প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আত্মার শান্তি।"

১৯০১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাম দিয়া সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের ন্যায় শহরের কোলাহল ও কৃত্রিমতা হইতে দূরে মুক্ত আকাশের তলে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাহাতে সহজে স্বাধীনভাবে ছেলে মেয়েরা গড়িয়া উঠিতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারে ইহাই হইল কবির স্বপ্ন ও সাধনা। যতদূর সম্ভব এখানে খোলা আকাশের তলে মুক্তবায়ুতে উদ্যানের মধ্যে অধ্যাপনা করা হয়। প্রতিষ্ঠাতার একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি বড় হইয়া উঠে এবং পৃথিবীর নানাস্থানের মনীষী ও চিন্তাশীল বিদ্বদ্ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে কবি এই বিদ্যালয়ের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত ও পুনর্গঠন করিয়া বিশ্বভারতী নাম দিয়া একটি সত্যকার আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত অনুশীলন ও গবেষণা করা এবং তাহাদের ঐক্য ও মিলনের সাহায্যে জগৎ হইতে আন্তর্জ্জাতিক হিংসা ও বিদ্বেষ নির্ম্মূল করিয়া মানবতার বিজয় গৌরব ঘোষণা করা। এখন এই শিক্ষায়তনে শিশুশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম গবেষণার নানারূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাঠভবন (স্কুল) শিক্ষাভবন (কলেজ) কলাভবন (আর্ট স্কুল) সঙ্গীতভবন, বিদ্যাভবন গবেষণা মন্দির ও নিকটস্থ সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন (আদর্শ পল্লী গঠন ও কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র)

প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ। সুরুলে পূর্ব্বে ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখানকার প্রথম কুঠিয়াল শ্রীযুত জন্ চীপ্ ৪১ বৎসর কাল সুরুলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সাধারণ শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর আদ্য, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, আই-এসসি ও বি, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, ভারতীয় নৃত্য, কৃষিবিদ্যা, বয়নশিল্প, প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে। শান্তিনিকেতনে পৃথক ডাক ও তারঘর, বিজলীআলো, জলের কল ও ছোট একটি হাঁসপাতাল আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার, বালকদের জন্য অনেকগুলি ছাত্রাবাস ও বালিকাদের জন্য শ্রীভবন নামে একটি সুন্দর ছাত্রীনিবাস আছে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্মানী, চীন, জাপান, ইরাণ প্রভৃতি বহু দেশের মনীষী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সূত্রে আগমন করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন শুধু বাংলার বা ভারতের নহে, সমগ্র এশিয়ার গৌরবস্থল।

বোলপুর হইতে ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা লর্ড সিংহের জন্মস্থান রাইপুর যাইতে হয়। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সুপুরে সুরথরাজার পূজিত বলিয়া কথিত সুরথেশ্বর শিব বর্ত্তমান। প্রবাদ সুরথ রাজা চণ্ডিকার নিকট লক্ষ বলি প্রদান করিলে এই স্থানের নাম হয় বলিপুর। বোলপুর নাম বলিপুর হইতে হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

বোলপুরের চারি মাইল পূর্ব্বোত্তরে শিয়ান নামক গ্রামে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। এখানে মুনিকুণ্ড নামক একটি শীতল প্রস্রবণ আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এখানে একটি বড় মেলা হয় ও বহুলোক এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে তাঁহার পিতা বিভাণ্ডক মুনি এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়া ভাণ্ডীরবনে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। [শিউড়ী দ্রষ্টব্য ।]

বোলপুর হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে **ইলামবাজার** গালা ও লাক্ষা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। ইলামবাজার ছাড়াইয়া বোলপুর স্টেশন হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে মোটরবাসযোগে গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান **কেন্দুবিল্ব** বা কেঁদুলিতে যাওয়া যায়। কবির প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউ আজও নিত্য পূজিত হইতেছেন। যে আসনে বসিয়া কবি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা আজিও সযত্নে রক্ষিত আছে। মকর সংক্রান্তির দিন কেঁদুলীতে জয়দেব গোস্বামীর মহোৎসব নামে একটি বৃহৎ মেলা হয়। মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। এই মেলার একটি বিশেষ অঙ্গ হইল গীতগোবিন্দ গান করা। এই কাব্যের আদর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র। পুরীধামে জগন্নাথদেবের পূজা পাঠে ইহা নিত্য গীত হয়। অণ্ডাল জংশনের নিকটবর্ত্তী মেন্ লাইনের দুর্গাপুর স্টেশন হইতেও মোটরবাসযোগে কেন্দুবিল্বে যাওয়া যায়। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখার দুবরাজপুর স্টেশন হইতেও যাওয়া চলে।

কেঁদুলীর অনতিদূরে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে প্রাচীন ত্রিষষ্ঠীগড় বা ইছাই ঘোষের অজয় ঢেকুরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে ইছাই ঘোষের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ইছাই ঘোষ শক্তির উপাসক ছিলেন। ত্রিষষ্ঠীগড়ের রাজা কর্ণসেনকে পরাজিত করিয়া তিনি অজয়তীরে এক দেউল নির্ম্মাণ করেন ও তথায় তাঁহার উপাস্যা দেবী শ্যামারূপাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শ্যামারূপা আজও পূজা পাইতেছেন। ঢেকুরের নিকটবর্ত্তী লাউসেনতালাও,

ছোটদের শিক্ষা, শান্তিনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

পল্লী উন্নয়ন কার্য্য, শ্রীনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)
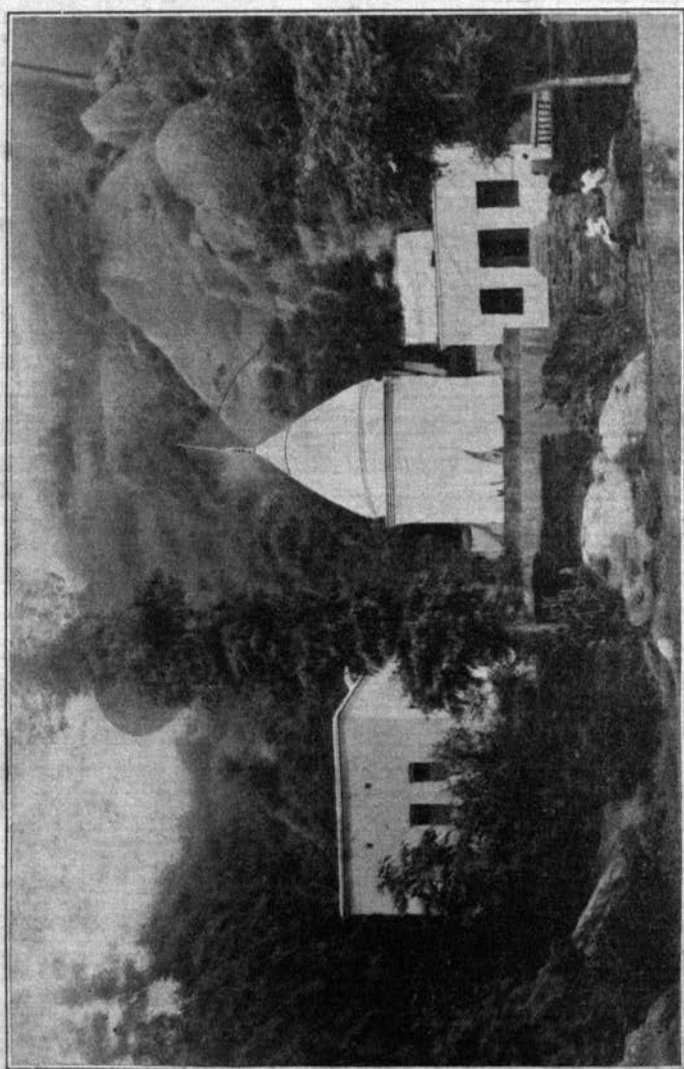
তপোবন, বৈদ্যনাথধাম (পৃষ্ঠা ৯০)

কান্দুনেডাঙ্গা ও রক্তনালী প্রভৃতি স্থান মহাবীর লাউসেন ও ইছাই ঘোষের যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের হস্তে ইছাই ঘোষ নিহত হন।

কোপাই—খানা জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। স্টেশনের অনতিদূরে কোপাই নামক উত্তরবাহিনী নদীর তীরে একটি পীঠস্থান আছে। এখানে দেবীর কঙ্কাল পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। এই স্থান কঙ্কালীতলা নামে পরিচিত। এই স্থানের একটি কুণ্ডের জল বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। যাত্রিগণ এই কুণ্ডে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে।

আহমদপুর জংশন—খানা জংশন হইতে ৩৬ মাইল। ইহাও একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা আহমদপুর-কাটোয়া নামক লাইট রেলওয়ের সহিত একটি জংশন স্টেশন।

আহমদপুরের দুই মাইল দূরে বেলিয়া বা বেলে নামক গ্রামে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের এক মন্দির আছে। বাত রোগের দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জন্য এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রাঢ় দেশে ধর্ম্মঠাকুরের যতগুলি মন্দির আছে, বেলের মন্দির তাহাদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত।

সাঁইথিয়া জংশন—খানা জংশন হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সাঁইথিয়া স্টেশনের নিকটে একটি পীঠস্থান আছে, উহার প্রাচীন নাম নন্দীপুর। এই স্থানে দেবীর হাড় পড়িয়াছিল, দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশ্বর। রেল লাইনের পার্শ্বে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। সাঁইথিয়ার ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে মৌড়েশ্বর গ্রামে মৌড়েশ্বর নামে এক প্রাচীন শিব আছেন। এই গ্রামের রাজা মুকুটরায় বৈষ্ণবশিরোমণি নিত্যানন্দের মাতামহ ছিলেন। সাঁইথিয়ার পাচ মাইল পূর্ব্বদিকে কোটাসুর নামে একটি গ্রাম আছে। প্রবাদ, এই স্থানে হিড়িম্ব ও বক রাক্ষসের বাসস্থান ছিল। অসুরের কোট বা বাসস্থান বলিয়া গ্রামের নাম কোটাসুর হইয়াছে। সাঁইথিয়ার ১১ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত গনুতিয়া গ্রাম রেশম শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

অণ্ডাল জংশন হইতে একটি শাখা লাইন সাঁইথিয়ায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মল্লারপুর—খানা জংশন হইতে ৫৪ মাইল দূর। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এই গ্রামে মল্লেশ্বর নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিব আছেন। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শিবপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে যে দ্রৌপদীর হরণে অকৃতকার্য্য ও ভীম কর্ত্তৃক অপমানিত জয়দ্রথ এই শিবপাহাড়ীতে আসিয়া সিদ্ধনাথ শিবের উপাসনা করিয়া যুদ্ধে অজেয়তার বর লাভ করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা হয়।

মল্লারপুর হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে বীরচন্দ্রপুর ও গর্ভবাস নামক স্থানদ্বয় বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয় তীর্থ। গর্ভবাসের প্রাচীন নাম একচক্রপুর বা একচাকা। এই গ্রামের সহিত পাণ্ডবগণের সংশ্রব ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। প্রবাদ অনুসারে এই স্থানে ভীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার ভগ্নী ও ঘটোৎকচের মাতা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একচক্রপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন।

বৈষ্ণবজগতে তিনি বলরামের অবতাররূপে পূজিত। নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী উপলক্ষে গর্ভবাসে এবং দোল ও রাসযাত্রার সময় বীরচন্দ্রপুরে মহোৎসব হয়। মল্লারপুর হইতে বীরচন্দ্রপুর শীতকালে মোটরবাসযোগে এবং অন্যান্য সময় গো-যানে যাওয়া যায়। একচক্রপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। পৌষ পূর্ণিমায় তথায় মহোৎসব ও তিন দিন ব্যাপী মেলা বসে।

রামপুর হাট—খানা জংশন হইতে ৬১ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার মহকুমা। এখানে সপ্তাহে দুই দিন খুব বড় হাট হয়। এই স্থানের তিন মাইল পশ্চিমে লালপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে।

রামপুর হাটের ৩ মাইল দূরে দ্বারকানদীর পূর্ব্ব তীরে চণ্ডীপুর বা তারাপুর গ্রামে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন যোগাশ্রম তারাপীঠ অবস্থিত। জনশ্রুতি, এই স্থানে সতীর চক্ষুতারা পতিত হইয়াছিল। কথিত আছে, যে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের অন্যতম বিখ্যাত সাধক বামা ক্ষেপা তারাপীঠে অবস্থান করিতেন। তিনিও একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তারাপীঠের মন্দিরটি নাটোরের মহারাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তারাপীঠে একটি মেলা হয়।

রামপুর হাট হইতে মোটরবাসযোগে সাঁওতাল পরগণা জেলার সদর শহর দুমকায় যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল।

নলহাটি জংশন—খানা জংশন হইতে ৭০ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও সমৃদ্ধিশালী শহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও জলবায়ু পশ্চিমের মত সতেজ ও স্বাস্থ্যকর। নলহাটির নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের ঝরণার জল হজমী গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। বহুদূর হইতে লোকে এখানে জল নিতে আসে। এই স্থানে কখনও ম্যালেরিয়া দেখা যায় নাই। অনেকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন। এই স্থানে সুলভে খাদ্যাদি ও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। শহরবাসের প্রায় সকল প্রকার সুখসুবিধাই এখানে মিলে। যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তন ও তীর্থ দর্শন এক সঙ্গে করিতে চাহেন, অথচ অধিক দূরে যাইতে ইচ্ছুক নহেন, নলহাটি তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত স্থান।

নলহাটি একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ললাট পড়িয়াছিল, দেবীর নাম ললাটেশ্বরী, ভৈরব যোগীশ। শহরের একটি উচচ টিলার উপর ললাটেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। নলহাটি স্টেশনের নিকটে নলরাজার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নলরাজা কে ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। নলহাটিতে উত্তম কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

মুরারই—খানা জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে কনকপুর গ্রামে অপরাজিতা নামে এক প্রাচীন পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি বিরাজিত। মুরারই হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে বীরকিটি নামে একটি স্থান আছে। মুর্শিদাবাদ বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণ মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত বিবাদের ফলে বড়নগর ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বসতি করেন।

বীরকিটির গড় একটি উচচ টিলার উপর অবস্থিত ছিল। রাজা উদয়নারায়ণের সহিত রাজস্ব ব্যাপার লইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ প্রান্তরে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। বীরকিটির দুই মাইল পূর্ব্বদিকে জগন্নাথপুর গড়ে রাজা উদয়নারায়ণের সেনাগণ শিবির সন্নিবেশ করে এবং এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হয়। এই যুদ্ধ "জগন্নাথপুরের যুদ্ধ" নামে খ্যাত। নবাবের সেনাপতি গোলাম মহম্মদ এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন কিন্তু সপুত্র উদয়নারায়ণ নবাব সৈন্যের হস্তে বন্দী হন। যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল উহা আজও মুণ্ডমালা বা "মুড়মুড়ের ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তথায় বন্দুকাদির টুকরা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। অপরাজিতাদেবীর প্রাচীন মন্দির রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়।

রাজগাঁ—খানা জংশন হইতে ৮৭ মাইল দূর। এই স্থান হইতে চার মাইল পশ্চিমে বীরনগর গ্রামে রাজবাড়ী নামে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ, উহা বীরসেন নামক রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। নিকটেই সীতাপাহাড়ী নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। কথিত আছে যে বনবাসকালে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র এই পাহাড়ের গুহায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

পাকুড়—খানা জংশন হইতে ৯৪ মাইল দূর। ইহা সাঁওতাল পরগণা জেলার একটি মহকুমা। স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধিশালী। এখান হইতে রেল লাইনের জন্য পাথর সংগ্রহ করা হয়। রাজা নামে পরিচিত একঘর জমিদার এখানে বাস করেন। এই শহরে তাঁহাদের বহু কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাকুড়ের পর এই লাইন বারহাড়োয়া জংশন, তিনপাহাড় জংশন, সকড়িগলি জংশন, ভাগলপুর জংশন ও জামালপুর জংশন হইয়া প্রধান লাইনের কিউল জংশনে মিশিয়াছে। এই শাখার তিনপাহাড় জংশন হইতে ক্ষুদ্র একটি শাখা লাইন গঙ্গার তীরবর্ত্তী রাজমহলে পৌছিয়াছে। রাজমহল এককালে বাংলার রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল "আক্ মহল"। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ওড়িষ্যা বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে মানসিংহ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। উত্তরকালে রাজধানী ঢাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বর্ত্তমানে ইহা একটি নগণ্য পল্লী মাত্র। গ্রামের পশ্চিমদিকে প্রায় চার মাইল ব্যাপিয়া পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। জুম্মা মসজিদ, শাহ সুজা ও মীরকাসিমের প্রাসাদ, ফুলবাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রাজমহলের পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উধুয়ানালায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নবাব মীর কাসিমের সেনাবাহিনী ইংরেজদের নিকট সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়; ইহার পর হইতে ইংরেজদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জঙ্গীপুর রোড স্টেশনও পূর্ব্বভারত রেলপথের মুর্শিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।
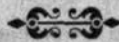
(৬) সীতারামপুর—ধানবাদ—গোমো জংশন
(গ্রাণ্ড কর্ড লাইন)

কুলটি—সীতারামপুর হইতে ৩ মাইল দূর। ইহা খনি অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে ও নিকটবর্ত্তী হীরাপুরে লৌহের কারখানা আছে।

বরাকর—সীতারামপুর জংশন হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার শেষ স্টেশন। ইহা বরাকর নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর পরপার হইতে মানভূম জেলার আরম্ভ। এখানে নদীর উপর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও রেল লাইনের দুইটি সুন্দর সেতু আছে। ইহা একটি বিখ্যাত ব্যবসায়ের স্থান। এখানকার জলহাওয়াও বেশ ভাল। এই স্থানে কতকগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর পুরাতন মন্দির আছে।

বরাকর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাদলা পাহাড় নামক স্থানে "কল্যাণেশ্বরী" নামে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর প্রাচীন দেবী মন্দির আছে। প্রবাদ যে প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে কল্যাণ সিংহ নামক জনৈক রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কল্যাণেশ্বরীর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। একখানি প্রস্তরখণ্ডকে দেবীর প্রতিনিধিরূপে পূজা করা হয়। কথিত আছে একদিন এক ব্রাহ্মণ মন্দির পার্শ্বস্থ জলাশয় হইতে অলঙ্কার শোভিত দুইটি হস্ত উঠিতে দেখেন। তিনি রাজা কল্যাণ সিংহকে ইহা বলিলে রাজা আসিয়াও হস্ত দুটি দেখিতে পান। রাত্রে দেবী রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া এই প্রস্তর খানির পূজা করিতে নির্দ্দেশ দান করেন।

কুমারধুবি—সীতারামপুর হইতে ৭ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শ্রমিক কেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি কলকারখানা আছে।

ধানবাদ জংশন—সীতারামপুর হইতে ২৫ মাইল। ইহা মানভূম জেলার মহকুমা ও খনি অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এই শহরটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন কয়লার খনি অঞ্চলের ঝরিয়া হইয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পাথরডিহি পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটি শাখা লাইন কাত্রাস্‌গড় হইয়া ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী বামো পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাত্রাস্‌গড়ের ৮ মাইল দক্ষিণে দামোদরের উভয় কূলে চেচগাঁগড় ও বেলোঞ্জা নামক গ্রামে বহু পুরাতন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরগুলির সুন্দর কারুকার্য্যের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। এই স্থানদ্বয়ে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বেলোঞ্জায় একটি প্রকাণ্ড নগ্ন জৈন মূর্ত্তি আছে।

গোমো জংশন—সীতারামপুর জংশন হইতে ৪৯ মাইল। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জংশন স্টেশন। বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা লাইন আদড়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান।

পরিশিষ্ট

বাংলা দেশ হইতে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে যাইতে হইলে পূর্ব্বভারত রেলপথ দিয়াই যাইতে হয়। গয়া, কাশী, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা, হরিদ্বার, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ফয়জাবাদ, পাটনা, সাসারাম প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নগরীগুলি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। সুতরাং এই রেলপথে ভ্রমণ না করিলে উত্তর ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না।

বাংলা নাগপুর রেলপথে বাংলা দেশ

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে লণ্ডন শহরে "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি" সংগঠিত হয়। ঐ বৎসরই কোম্পানি "নাগপুর ছত্রিশগড় স্টেট রেলওয়ে" নামক রেলপথের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ঐ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮০৩ মাইল। তারপর কোম্পানি ক্রমান্বয়ে বহু স্থানে নূতন লাইন নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র লাইনের "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে" এই নামকরণ করেন। বর্ত্তমানে এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৩৯৮ মাইল ও ইহার স্টেশন সংখ্যা ৫০৪ টি। এই বিস্তৃত রেলপথ বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের বহু অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই রেলপথ দিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার লৌহ, কয়লা ও কাঠ প্রভৃতির আমদানি ও রপ্তানি হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই রেলপথ দিয়া প্রায় দুই কোটি যাত্রী ও দেড় কোটি টন মাল যাতায়াত করিয়াছে।

বাংলা দেশের হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান এই চারিটি জেলার মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত। এই জেলা গুলির যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানে এই রেলপথ দিয়া যাওয়া যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। বিহার প্রদেশের অন্তগত মানভূম জেলা ও ধলভূম মহকুমা প্রভৃতি যে সকল অঞ্চল ভাষা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বাংলা দেশ হইতে অভিন্ন, অথবা যাহাদের সহিত বহু বাঙালীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, তাহাদের বিবরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

(ক)—হাওড়া-খড়গপুর-দাঁতন

রামরাজাতলা—হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের রামনবমী তিথি হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে রামরাজার পূজা হইয়া থাকে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমান প্রভৃতি সমন্বিত রামরাজার প্রতিমূর্ত্তি অতি বৃহৎ আকারে নির্ম্মিত হয়। এত বড় প্রতিমা সচরাচর দেখা যায় না। রামরাজাতলার মেলায় প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তবে দশহরা, অম্বুবাচী, স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর ভিড় কিছু অধিক হয়।

রামরাজাতলা ষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত "শঙ্কর মঠ" একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। একটি মনোরম উদ্যান মধ্যে এই মঠটি অবস্থিত। ইহার নাটমন্দিরের প্রাচীর গাত্রে বিষ্ণুর দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। মঠে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য ও সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন শঙ্করাচার্য্যের জন্ম তিথির পূজা হয় এবং ঐ দিন রবিবার না হইলে পরবর্ত্তী রবিবারে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী তিথিতে সাবিত্রী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য বহু মহিলার সমাগম হয়।

শঙ্কর মঠের সংলগ্ন একটি চতুষ্পাঠী আছে। তথায় বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্র পড়ান হয়।

রামরাজাতলার নিকটবর্ত্তী বাকসাড়া নামক পল্লীতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্য্যন্ত "নবনারীকুঞ্জর" নামে আর একটি বারোয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। আটজন প্রধানা সখীসহ শ্রীরাধিকা একটি হস্তীর আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন,—ইহাই হইল নবনারীকুঞ্জরের পরিচয়। এই প্রতিমাটি একটি দেখিবার বস্তু। এখানেও বহু লোকের সমাগম হয়। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে মহাসমারোহে রামরাজা ও নবনারীকুঞ্জর প্রতিমাদ্বয় শোভাযাত্রাসহ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রামরাজাতলায় অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

সাঁতরাগাছি—হাওড়া হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। এখানে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান ইয়ার্ড অবস্থিত। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৭ মাইল দূরবর্ত্তী হাওড়া শহরের দক্ষিণস্থ শালিমার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান রঙের কারখানার জন্য বিখ্যাত। শালিমার ও খিদিরপুরের মধ্যে বি, এন, আর-এর খেয়া জাহাজে করিয়া মালগাড়ী পার করা হয়।

মৌড়িগ্রাম—হাওড়া হইতে ৭ মাইল দূর। ষ্টেশনের নিকটে একটি কাপড়ের কল আছে। ষ্টেশন হইতে মহীয়াড়ি বা মৌড়িগ্রাম প্রায় দেড় মাইল দূর। মৌড়িগ্রামের সরস্বতী নদী তীরস্থ শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। স্থানীয় জমিদার কুণ্ডুবাবুদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের রাসযাত্রা উপলক্ষে এখানে বিশেষ ধুমধাম হয় ও সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। এই মেলায় নানাস্থান হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

মহীয়াড়ির নিকটবর্ত্তী প্রশস্ত নামক গ্রামে পরলোকগত বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ভীম ভবানীর পৈতৃক নিবাস।

আন্দুল—হাওড়া হইতে ৮ মাইল দূর। আন্দুলের রাজবাড়ীর নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত। রামলোচন রায় নামক এক ভদ্রলোক লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন, তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘল রাজত্বকালের শেষ দিকে রামলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। সেই সময় হইতে এই বংশ রাজবংশ বলিয়া পরিচিত। আন্দুলের বর্ত্তমান জমিদারগণ এই রাজবংশের দৌহিত্র।

আন্দুলের কালীকীর্ত্তন গান এক সময়ে ভক্ত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর প্রাচীন মন্দির এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

সুবিখ্যাত সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার আন্দুলের অধিবাসী ছিলেন। সরকার মহাশয় "শকুন্তলা তত্ত্ব" "বিদ্যাসাগর চরিত" ও "ইংরাজের জয়" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বহুকাল "বঙ্গবাসী" সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

সাঁকরাইল—হাওড়া হইতে ১০ মাইল দূর। ইহা ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ স্থান। এখানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী, গ্রন্থাগার, ক্লাব ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি আছে। এখানে বিশালাক্ষী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। হেষ্টিংসের শাসনকালে এখানে মদনরায় নামক রাজা উপাধিধারী এক জমিদারের বাস ছিল। যে স্থানে তাঁহার বাসগৃহ ছিল, তথায় এখন "বেলভেডিয়ার" জুটমিল নামে একটি বড় পাটকল হইয়াছে।

উলুবেড়িয়া—হাওড়া হইতে ২০ মাইল দূর। ইহা হাওড়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানটি গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখানকার ইলিশ মাছ ও পান্তুয়া খুব বিখ্যাত। উলুবেড়িয়ার গঙ্গাতীরে অতি সুন্দর একটি কালীবাড়ী আছে। এখান হইতে "মেদিনীপুর কেনাল" নামক খাল ও "ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড" নামক রাস্তা বাহির হইয়াছে।

বীরশিবপুর—হাওড়া হইতে ২৩ মাইল দূর। এখানকার মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করিতে আসেন। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কাণসোণা গ্রামে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর আছে। রোগমুক্তি কামনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই এই পুকুরে স্নান করিয়া থাকেন।

দেউলটি—হাওড়া জেলার শেষ স্টেশন দেউলটি, হাওড়া হইতে ৩২ মাইল দূর। এখানে অনেক ফুলের বাগান আছে; এখানকার গোলাপ খুব বিখ্যাত। রুগ্ন গবাদি পশুর শুশ্রূষার জন্য এখানে একটি গোশালা ও তৎসংলগ্ন গোচরভূমি আছে।

দেউলটিতে নামিয়া সামতাবেড় নামক একখানি ছোট গ্রামে যাইতে হয়। এই গ্রাম ছোট হইলেও বাংলা সাহিত্যে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ে একখানি মনোরম পল্লী ভবন নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল সেইখানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় এই পল্লীখানি নবীন সাহিত্যিকদের তীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

কোলাঘাট—হাওড়া হইতে ৩৫ মাইল দূর। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর জেলার আরম্ভ। স্থানটি রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে রূপনারায়ণ নদের উপর বাংলা নাগপুর রেলপথের এক প্রকাণ্ড সেতু আছে। বর্ষাকালে রূপনারায়ণের রূপ অতি সুন্দর হইয়া উঠে।

কোলাঘাট একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র।

পাঁশকুড়া—হাওড়া হইতে ৪৪ মাইল। ইহা মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধস্থান। এখান হইতে আখের গুড়, বেগুন, মূলা ও কপি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য কলিকাতা, টাটানগর ও খড়গপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। কেনাল বা কাটাখালের জল সরবরাহের জন্য এখানে একটি "এনিকট্" আছে। এখানে ডাক্‌বাংলা, দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। স্টেশনের অনতিদূরে "জানুখণ্ডী" নামে একটি বৃহৎ দীঘি আছে।

পাঁশকুড়া হইতে দুই মাইল উত্তরে মহৎপুর নামক গ্রামে তারকেশ্বরের ন্যায় শ্মাশানেশ্বর শিবের মন্দির ও তৎপার্শ্বে একটি পুষ্করিণী আছে। রোগ আরোগ্য কামনায় বহু ব্যক্তি এই মন্দিরে আসিয়া ধর্ণা দেয়। চড়কের সময় এইস্থানে একটি মেলা হয়।

পাঁশকুড়া হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রঘুনাথবাড়ী গ্রামে রঘুনাথজীউ বা রামচন্দ্রের একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর বিজয়া-দশমীর দিন হইতে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা হয়। রঘুনাথজীর মন্দির প্রাঙ্গনে একটি ছোট কামান আছে। উহা কাশীজোড়ার ক্ষত্রিয়রাজগণের প্রাচীন কামান বলিয়া বিখ্যাত। রঘুনাথবাড়ী হইতে ৩ মাইল দূরে হরশঙ্কর গ্রামে এই রাজবংশের গড়ের চিহ্ন ও একটি বৃহৎ কামান দেখা যায়। রঘুনাথবাড়ীতে অতি সুন্দর ও মূল্যবান মছলন্দ বা মাদুর প্রস্তুত হয়।

পাঁশকুড়া স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে প্রতাপপুর নামে একটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম আছে। এখানকার হাটে প্রতি বৃহস্পতিবার অসংখ্য গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়।

তমলুক

পাঁশকুড়া হইতে মোটরযোগে মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান তমলুকে যাইতে হয়। পাঁশকুড়া হইতে তমলুক ১৬ মাইল দূর। ইহা রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তটে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে তমলুক বহু নামে পরিচিত ছিল, যথা, তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তমোলিপ্তি, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকুল ইত্যাদি। চৈনিক পর্য্যটকগণ ইহাকে তেমোলিতি ও "তম্মোলিত্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন পুরাকালে বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং তমলুক তাঁহাদেরই একটি প্রধান নগর ছিল। তামিল-জাতি যে বাংলাদেশ হইতে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বাংলার রাজধানী তমোলিত্তি বা তাম্রলিপ্ত হইতে তামিলজাতির নামকরণ হইয়াছে, অনেকেই পণ্ডিত কনকসভাই পিলের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রাবিড়, দামল বা তামল তামিল জাতির আবাসস্থল তাম্রলিপ্তির আদি নাম সম্ভবতঃ

দামলিপ্ত ছিল। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আর্য্যগণ এই নগরের নাম "তমোলিপ্ত" বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত রাখেন বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। পরে এইস্থানে আর্য্যসভ্যতার অভ্যুদয় হইলে তাঁহারা তমোলিপ্ত নামের ঘৃণাসূচক ব্যাখ্যারও পরিবর্ত্তন করেন। দ্রাবিড় বা দামল জাতিকে আর্য্যেরা ঘৃণাভরে অসুর বলিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরাজয়ের পর হইতেই তমোলিপ্ত "তাম্রলিপ্ত" বা "তাম্রলিপ্তি" নামে পরিচিত হয়। অসুরগণকে নিধনকালে বরাহরূপধারী বিষ্ণুর দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়, এইরূপ একটি কাহিনীও আছে। এই জন্য আর্য্যগণ তমোলিপ্তের নাম দেন "বিষ্ণুগৃহ"।

মহাভারতে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে এখানে মহাভারতোক্ত তাম্রধ্বজ রাজার রাজধানী ছিল। তাম্রধ্বজ পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ধারণ করেন ও মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহার সহিত সখ্যসুত্রে আবদ্ধ হন। রাজা তাম্রধ্বজের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত কৃষ্ণার্জ্জুনের মূর্ত্তি এখনও তমলুকের রাজবাড়ীতে জিষ্ণু হরি নামে পূজিত হইতেছে। প্রায় ত্রিশ একর জমির উপর প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। কথিত আছে, রাজা তাম্রধবজ ও তাঁহার রাণী এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া তাহার মধ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় উভয়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ দীঘিটি বর্ত্তমানে "খাটপুকুর" নামে পরিচিত।

জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধগ্রন্থের নানাস্থানেও তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং তজ্জন্য ইহার অপর নাম ছিল বেলাকূল। তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি তখন সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে জাহাজ নিৰ্ম্মিত হইত। কথিত আছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন সেই বৎসর বাংলার রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ তাম্রলিপ্তে নিৰ্ম্মিত জাহাজ লইয়া সিংহলদ্বীপ জয় করেন। বিজয়সিংহের নাম হইতেই সিংহল নামের উৎপত্তি হয়।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভারতের প্রধান সঙ্ঘারাম তৎকালে তাম্রলিপ্তে অবস্থিত ছিল।

সম্রাট অশোকের সময় তাম্রলিপ্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সম্রাট অশোক সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুশাসনগুলি প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত হইত। তাম্রলিপ্তনগরেও একটি অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙ উহা দেখিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পৃথিবীর দিকে দিকে বুদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলরাজ তিষ্যের আমন্ত্রণে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪৩ অব্দে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীসহ তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সিংহলে যাত্রা করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে যাইবার জন্য তাম্রলিপ্ত প্রধান বন্দর ছিল।

পরবর্ত্তীকালে গুপ্তরাজগণ, বঙ্গরাজ শশাঙ্ক ও সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন তাম্রলিপ্ত জয় করেন।

চৈনিক পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণ হইতে তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ইতিহাস বিশ্রুত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণে আগমন করেন এবং তাঁহার ভ্রমণকালের শেষ দুই বৎসর ৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ তাম্রলিপ্ত নগরে অবস্থান করিয়া বহু বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতিলিপি ও দেবমূর্ত্তির চিত্র গ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্তে ২৪টি সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধশ্রমণ দেখিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই তিনি সিংহলে গমন করেন।

য়ুয়ান্ চোয়াঙের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও তাম্রলিপ্তের বাণিজ্যসম্পদ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে তিনি সমতট অর্থাৎ বর্ত্তমান ঢাকা হইতে পশ্চিমদিকে নয় শত "লি" অতিক্রম করিয়া তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হন। তখন তাম্রলিপ্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ নিম্নভূমিতে অবস্থিত ছিল। রাজ্যের পরিধি ছিল ১৪০০ "লি" এবং রাজধানীর বিস্তার ১০ লি'র অধিক ছিল। তাম্রলিপ্তে তখন ১০টি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং এক হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। নগরের এক প্রান্তে প্রায় একশত ফুট উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ ছিল। ইহা ছাড়া য়ুয়ান্ চোয়াঙ তাম্রলিপ্তে ৫০টি হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ও সমৃদ্ধ ছিলেন। য়ুয়ান্ চোয়াঙ আরও লিখিয়াছেন যে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত সমুদ্রসলিলের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল।

ইহার পর ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-চিং নামক আর একজন বৌদ্ধ পর্য্যটক সেঙ্ চউ নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য কয়েক বৎসর নালন্দার মহাবিহারে অবস্থান করিয়া পুনরায় তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজযোগে দক্ষিণদিকে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে চারিশত যোজন ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিনশত যোজনের অধিক ছিল। শ্রীনালন্দা ও "মহাবোধি" হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৬০ যোজন। ই-চিং তাম্রলিপ্তে পাঁচ ছয়টি ধর্ম্মমন্দির দেখিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের অধিবাসিগণকে ধনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ই-চিংয়ের পর আরও কয়েকজন বৌদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারাও তাম্রলিপ্তের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যান্টন যাত্রা করেন। তাঁহার কাষায় বস্ত্র ও ভিক্ষা-ভাণ্ড জাপানের ইকরুণ মঠে বহুকাল সসম্মানে রক্ষিত ছিল। তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতহৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারিণী" নামক বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। জাপানের প্রসিদ্ধ হোরিউজি মঠ হইতে ঐ গ্রন্থ দুইখানি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে ওড়িষ্যারাজ চোল গঙ্গদেব মেদিনীপুর জয় করেন। সেই সময় হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। সমুদ্র ক্রমে ক্রমে এই স্থান হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া এই প্রসিদ্ধ বন্দরকে বর্ত্তমানে একটি নগণ্য উপনগরে পরিণত করিয়াছে।

বর্ম্মার পেগু জেলার কল্যাণী গ্রামে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পেগুতে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি অপূর্ব্ব। সেই জন্য সাধারণ লোকের ধারণা যে ইহা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কবে এবং কাহার দ্বারা যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। রূপনারায়ণ নদের তটে একটি উচ্চ ভূখণ্ডে উন্নত পাদ-পীঠের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের উন্নত চূড়া বহুদুর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে অনুমান করেন, সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্তে যে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহার উপরই এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটির বহির্ভাগের গঠনপ্রণালী বাংলার স্থাপত্যরীতি হইতে পৃথক। ভিতরের গঠনপ্রণালী বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইলে কোন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহারই হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়। ৩০ ফুট উচ্চ বুনিয়াদের উপর মূল মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মনে হয় যে ছাদটি যেন একখণ্ড অতি বৃহৎ শ্বেতপ্রস্তরের চাপ হইতে কুঁদিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। খাঁজ কাটিয়া প্রস্তর খোদাই করা হইয়াছে বলিয়াই ইহার শোভা হইয়াছে অতি অনুপম এবং কোথাও জোড় আছে বলিয়া ধরা যায় না। মূল মন্দিরটির সম্মুখে "যজ্ঞমন্দির" নামে আর একটি মন্দির আছে। এই দুইটি মন্দির "জগমোহন" নামে একটি খিলানের দ্বারা সংযুক্ত। যজ্ঞমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও গীতবাদ্যাদির জন্য "নাটমন্দির" আছে। উহার সম্মুখে তোরণ ও নহবৎখানা।

একখণ্ড প্রস্তরের সম্মুখভাগ কুঁদিয়া বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ধরণের নির্ম্মাণপ্রণালী বড় একটা দেখা যায় না। মূর্ত্তিটি উগ্রতারা মূর্ত্তির অনুরূপ। দেবীমূর্ত্তির বেদীর নিম্নে সোপানশ্রেণীর মধ্যে "ভূতিনাথ" ভৈরব অবস্থিত। বর্গভীমা দেবী বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে বহুদেবমূর্ত্তি-ভগ্নকারী কালাপাহাড় ওড়িষ্যা বিজয় অভিযানের পথে এই দেবীকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং ফারসীতে একখানি দলিল লিখিয়া দিয়া যান। "বাদশাহী পাঞ্জা" নামে অভিহিত দলিলখানি আজিও বর্গভীমার পূজকগণের নিকট আছে। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ নিম্নবঙ্গের সর্ব্বত্র নিদারুণ অত্যাচার করিলেও এই দেবীর ভয়ে তমলুকে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। বরং এই দেবীকে তাহারা বহু অলঙ্কারে সাজাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিত।

বর্গভীমাদেবী একান্নপীঠের অন্তর্গত না হইলেও অনেকে ইহাকে উপপীঠ মনে করেন এবং সেই জন্য এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অপর কোন দেবী প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করেন না।

বর্গভীমা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে তিনটি কিংবদন্তী আছে। প্রথম কিংবদন্তীর মতে সুপ্রসিদ্ধ ধনপতি সদাগর যখন সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা করেন তখন তাম্রলিপ্তে তিনি এক ব্যক্তির হস্তে একটি সুবর্ণ ভৃঙ্গার দেখিয়া সে উহা কোথায় পাইল তাহা জিজ্ঞাসা করেন। সে উত্তর দেয় যে নগরের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যে এক অদ্ভুত কুণ্ড আছে। উহার জলে পিতলের জিনিস ডুবাইলে তাহা সোনার হইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া ধনপতি তাম্রলিপ্তের বাজারের সমস্ত পিতলের জিনিস কিনিয়া সেই

কুণ্ডে ডুবাইয়া সমুদয় পিতলকে স্বর্ণে পরিণত করেন। সিংহল পত্তনে সেই সোণা বিক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থ লাভ করেন। গৃহে ফিরিবার সময় ধনপতি সেই কুণ্ডে আসিয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে একজন ধীবর রমণী তাম্রলিপ্ত-রাজ তাম্রধ্বজের রাজসংসারে প্রত্যহ মাছের যোগান দিত। একদিন পূর্ব্বোক্ত অরণ্য পথে আসিবার সময় ধীবর রমণী উক্ত কুণ্ড হইতে কিছু জল লইয়া মৃত মৎস্যের উপর ছিটাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে মৎস্যগুলি পুনর্জ্জীবন লাভ করে। এই সংবাদ তাম্রধ্বজের কর্ণগোচর হইলে তিনি ধীবর রমণীকে সঙ্গে লইয়া কুণ্ডটি দেখিতে যান। কিন্তু কুণ্ডের পরিবর্ত্তে সেখানে একটি বেদী ও তদুপরি এক প্রস্তরময়ী দেবী মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাম্রধ্বজ তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় প্রবাদ অনুসারে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কালু ভুঁইয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন কাল হইতেই তাম্রলিপ্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই নিকট প্রসিদ্ধ স্থান। পুরাকালে ইহা হিন্দুগণের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ছিল। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে শিব দক্ষকে নিহত করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে দক্ষের ছিন্ন মস্তক তাঁহার হস্তে আবদ্ধ হইয়া যায়। পাপমোচনের জন্য শিব বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন, কিন্তু হস্ত হইতে কপাল বা মস্তক কিছুতেই মুক্ত হয় না। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দ্দেশক্রমে তিনি তমলুকের একটি অজ্ঞাত তীর্থে আসিয়া স্নান করায় দক্ষ-শির তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। এই জন্য এই তীর্থটির নাম হয় "কপাল-মোচন"। কপালমোচন সরোবরের নাম ও মাহাত্ম্য বহু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কালক্রমে এই সরোবরটি রূপনারায়ণ নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। কিন্তু আজও প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে বহু নরনারী বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের প্রান্তবাহী রূপনারায়ণে স্নান করিয়া কপাল-মোচন তীর্থ স্নানের পুণ্যকার্য্য সমাধা করেন।

তমলুকের খাট পুকুরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একখানি পাথরকে লোকে "নেতা ধোপানীর পাট" নামে অভিহিত করে। মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত আছে যে নেতা ধোপানীর সহায়তায় বেহুলা মৃত পতি লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়।

তমলুকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে গৌরাঙ্গ দেবের অন্যতম পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরকে পটভূমি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "যুগলাঙ্গুরীয়" নামক উপন্যাস রচনা করেন।

তমলুকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

তমলুক হইতে মোটরবাস যোগে নন্দকুমার নামক স্থান হইয়া মহিষাদলে যাইতে হয়। নন্দকুমার গ্রামে স্বনামখ্যাত মহারাজ নন্দকুমারের একটি বাটী ছিল। এখনও এই বাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

মহিষাদল—মহিষাদলে রাজা উপাধিধারী একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। পরিখা-বেষ্টিত রাজবাটী দেখিতে অতি সুন্দর। রাজাদের সতের চূড়ার একটি বৃহৎ ও বিখ্যাত রথ আছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির, রামচন্দ্রের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, সিংহবাহিনী দেবী এবং দধিবামন বিগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

দোরো সুতাহাটা—মহিষাদল হইতে একটি মোটর রাস্তা দোরো সুতাহাটা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থানে নীল প্রস্তরে নির্ম্মিত মাধব, সাগর মাধব ও নীল মাধব নামক তিনটি অতি সুন্দর প্রাচীন বিগ্রহ আছে। অনেকে এই মূর্ত্তিগুলিকে বৌদ্ধ যুগের বলিয়া অনুমান করেন। দোরোতে রাজা যাদবরাম রায় নামে এক দানশীল জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রবধু রাজা কুমার নারায়ণের পত্নী রাণী সুগন্ধা দেভোগ নামক স্থানে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে একটি সুন্দর নবরত্ন মন্দির ও এক বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাও এই অঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু।

ময়না—তমলুক হইতে ময়না বা প্রাচীন ময়নাগড় নয় মাইল। নবম শতাব্দীতে ধর্ম্মপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ময়নাগড়ে কর্ণসেন নামে এক রাজা ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়গড়ের সামন্ত গোপ-রাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্ণসেনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন, যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয় এবং সেই শোকে কর্ণসেনের পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। ইছাই ঘোষ মহাশাক্ত ও ভবানী দেবীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য রাজা কর্ণসেন গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শ্যালিকা ধর্ম্মউপাসিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্ম্মপালের মহিষী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। ধর্ম্মঠাকুরের বরে রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেন নামে কর্ণসেনের এক পুত্র হয়। ধর্ম্মের বরপুত্র মহাবীর লাউসেন ভবানীর বরপুত্র ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতার হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। লাউসেন কামরূপকামাখ্যা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ও মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্ম মঙ্গল" কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ময়নাগড়ের রঙ্কিনী নাম্নী কালী ও লোকেশ্বর শিব এবং ময়নার সন্নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন চকের ধর্ম্মঠাকুর লাউসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অজয়গড় বা অজয়চেকুর অজয়নদের তীরে আজও দেখা যায়।

ময়নাগড়ের প্রাচীন কীর্ত্তি আজও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। ভিতরগড়ের ক্ষেত্রফল ৬২,৫০০ বর্গফুট, উহার চতুর্দ্দিকে পরিখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৭০০ ফুটেরও অধিক। বাহিরগড় বা দ্বিতীয় পরিখার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪০০ ফুট। ভিতর ও বাহির উভয় গড়ের পরিখার বিস্তৃতি প্রায় ১৫০ ফুট। বর্গীদের উপদ্রবের সময় অনেকে নিরাপত্তার জন্য এই গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। উভয় পরিখার মধ্যবর্ত্তী স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলের মধ্যে হরিণ ও ময়ুর দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে কামান বসাইবার উচু ঢিপি এখনও বর্ত্তমান আছে।

ময়নার নিকটবর্ত্তী গোকুলনগরে সুন্দর সুন্দর নেটের মশারি প্রস্তুত হয়।

বালিচক্—হাওড়া হইতে ৫৭ মাইল দুর। ইহা একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল আছে। এখান হইতে দক্ষিণে সবঙ্গ ও উত্তরে লোয়াদা পর্য্যন্ত

মোটরবাস যাতায়াত করে। সবঙ্গ মাদুরের জন্য বিখ্যাত। লোয়াদা বাতাসা, মুগের জিলিপি ও গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বালিচক্ হইতে ৩ মাইল দূরে কেদার নামক গ্রামে কেদারেশ্বর শিবের মন্দির আছে। ইনি "ভুড়ভুড়ি কেদার" বা চপলেশ্বর শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহারই নামানুসারে এই পরগণার কেদারকুণ্ড নাম হইয়াছে। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যে তৎপূর্ব্ব হইতেই এখানে এই শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা যুগলকিশোর রায় নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের নির্ম্মাতা বলিয়া কথিত। মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি কুণ্ড হইতে সর্ব্বদাই ভুড়ভুড় শব্দে বুদ্বুদ উঠে। এই জন্য শিবের নাম ভুড়ভুড়ি কেদার হইয়াছে। সম্ভবতঃ নিকটস্থ ক্ষীরাই নদীর সহিত এই কুণ্ডের কোনরূপ যোগ থাকার জন্য এইরূপ জল বুদ্বুদ উঠিয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে সন্তান লাভ করা যায় এই বিশ্বাসে বহু নারী ঐ দিনে এখানে সমবেত হন এবং তদুপলক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। বালিচক্ হইতে কেদার পর্য্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়।

খড়্গপুর জংশন—হাওড়া হইতে ৭২ মাইল। এখানে বাংলা নাগপুর রেলের গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের বিরাট কারখানা অবস্থিত। রেলের কল্যাণে খড়্গপুর একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম হইতে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম শোভিত ও বিদ্যুৎ-আলোকোজ্জ্বল বিশাল শহরে পরিণত হইয়াছে। ইহা বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি প্রধান জংশন। পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত তরুলতাহীন উচ্চ ভূখণ্ড ছিল; চারিদিকের সমতল ভূমি হইতে ইহা প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ ছিল এবং লোকে ইহাকে "খড়্গপুরের দমদমা" বলিত। ইহার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে বহুদূর গ্রামগুলিকে নিম্নভূমি বলিয়া মনে হইত। খড়্গপুরে মাটীর রঙের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এখান হইতেই পাথুরে মাটী ও গৈরিক রঙ্ আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার প্লাটফরম খুব দীর্ঘ; ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে প্লাটফরমগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।

ষ্টেশনের নিকটে ইন্দাগ্রামে খড়্গেশ্বর নামে শিবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। ইহা খড়্গপুর থানার কলাইকুণ্ডা গ্রামের ধারেন্দার রাজা খড়্গসিংহের নির্ম্মিত; মতান্তরে বিষ্ণুপুর রাজ খড়্গমল্ল ইহার প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি একটি বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের নাম "হিড়িম্বডাঙ্গা"। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চ পাণ্ডব এই স্থানে আগমন করিলে হিড়িম্ব রাক্ষসের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয় এবং ভীমের হস্তে হিড়িম্বের নিধন ঘটে। হিড়িম্বের ভগিনী হিড়িম্বা ভীমের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করে। হিড়িম্বের নাম হইতেই "হিড়িম্বডাঙ্গা" নাম। খড়্গপুর ষ্টেশনের চারি মাইল পূর্ব্বদিকে চাঙ্গুয়াল গ্রামে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ, সেনানিবাস ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইগুলি এবং নিকটস্থ ঘোলাদীঘি গ্রামের "বীর সরোবর" প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয় রাজা বীরসিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণের কীর্ত্তি। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে দামোদর তীরে হেমসিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাহার ভ্রাতা বীরসিংহ তাম্রলিপ্ত, কর্ণদুগ ও বরদাভূমি জয় করেন। চাঙ্গুয়ালে তাঁহার রাজধানী ছিল।

কেশিয়াড়ী

খড়্গপুর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কেশিয়াড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। খড়্গপুর হইতে এই স্থানে মোটরবাসে যাওয়া যায়। এককালে নানা বর্ণের তসরের কাপড়ের জন্য এই

স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। এখনও এই স্থানে রেশমের কারবার আছে। কেশিয়াড়ীর সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির নিকটস্থ মঙ্গলমাড়ো নামক পল্লীতে অবস্থিত। এই মন্দিরটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার সিংহদ্বারের সম্মুখে একটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মসৃণদেহ বৃষের মূর্ত্তি আছে। বৃষটির সম্মুখের দুইটি পা ভগ্ন। ইহা কালাপাহাড়ের অত্যাচারের চিহ্ন বলিয়া কথিত। মন্দিরের সোপানের দুই পার্শ্বে দুইটি ছয় হাত উচচ প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহের মূর্ত্তি ও সম্মুখে বারটি খিলানযুক্ত "বারদুয়ারী" নামে একটি নাটমন্দির দৃষ্ট হয়। বারদুয়ারীর পরে জগমোহন মন্দির, এখানে যাবতীয় পূজাপাঠ হইয়া থাকে। এখানে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি গণেশমূর্ত্তি, খড়গ ও ত্রিশূলধারী মহাকাল মূর্ত্তি ও ত্রিশূলহস্তা কালভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। জগমোহনের ভিতর দিয়া মূলমন্দিরে যাইতে হয়। উচচ পাদপীঠের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি অবস্থিত। দেবীর মুখমণ্ডল সিন্দুরলিপ্ত, অঙ্গে বহু স্বর্ণালঙ্কার, দক্ষিণপদ বেদীর নিম্নদেশস্থ সিংহের উপর এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপিত। দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার প্রস্তর মূর্ত্তি। বেদীর বামপার্শ্বে একটি ছোট মঞ্চের উপর সর্ব্বমঙ্গলা, জয়া ও বিজয়ার পিত্তল নির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি অবস্থিত। সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর ভোগমূর্ত্তি বিজয়মঙ্গলা নামে অভিহিত। পর্ব্বোপলক্ষে এই মূর্ত্তিত্রয়কে জগমোহন মন্দিরে আনিয়া অর্চ্চনা করা হয়।

সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কালভৈরবের মূর্ত্তিটির গঠন-প্রণালী বুদ্ধমূর্ত্তির অনুরূপ। অন্যান্য স্থানে পশুবলি যেরূপ দেবীর সম্মুখভাগে হইয়া থাকে, এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। মূলমন্দিরের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে লোক চক্ষুর অগোচরে এখানে বলির কার্য্য সমাধা হয়। ইহাও বৌদ্ধপ্রভাবের লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হয়।

বিজয়মঙ্গলা মূর্ত্তির পাদপীঠের ও জগমোহনের দেউলসংলগ্ন প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে (১৫২৯ শকাব্দে) জমিদার রঘুনাথ শর্ম্মার পুত্র চক্রধর ভুঞা দেবীমন্দির ও জগমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ম্মকার রঘুনাথ কামিলা বিজয়মঙ্গলা মূর্ত্তির ও রাজমিস্ত্রী বাসুরাম জগমোহন মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বারদুয়ারীর প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সুন্দর দাস নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী রাজমিস্ত্রি বনমালী দাসের দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করান।

মুঘল শাসনকালে কেশিয়াড়ীতে একটি তহশীল কাছারি থাকায় বহু মুসলমান এখানে বাস করিতেন। তাঁহারা যে অংশে বাস করিতেন তাহা আজও "মোগলপাড়া" নামে পরিচিত। একটি প্রাচীন মসজিদের প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে উহা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিকটস্থ "তল কেশিয়াড়ী" গ্রামে বাদশাহ শাহ্ আলমের আমলে নির্ম্মিত অপর একটি মসজিদ আছে।

কেশিয়াড়ির তিন মাইল দূরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে একটি প্রাচীন ভগ্ন দুর্গ আছে। দুর্গের প্রাঙ্গনে একই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে একটি মন্দির ও একটি মসজিদ জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

খড়গপুর জংশন হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন টাটানগর, চক্রধরপুর প্রভৃতি হইয়া নাগপুর গিয়াছে এবং একটি শাখা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অভিমুখে ও অপরটি কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী ও মাদ্রাজের দিকে গিয়াছে।

শেষোক্ত শাখাপথে দাঁতন মেদিনীপুর জেলার তথা বাংলার শেষ স্টেশন; খড়্গপুর ও দাঁতনের মধ্যে নারায়ণগড় ও কাঁথি রোড উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

নারায়ণগড়—খড়গপুর হইতে নারায়ণগড় ১৪ মাইল দূর। হান্দোলগড় নামে এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দুর্গের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া কটক যাইবার রাস্তা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ দিয়া পুরী গিয়াছিলেন। এখানে ধলেশ্বর নামক এক শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে এখানে কেশব সামন্ত নামে একজন ধনী ভূস্বামী বাস করিতেন। চৈতন্যদেবের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কেশব তাঁহার ভক্ত হন।

পূর্ব্বকালে নারায়ণগড়ের চারিদিকে চারিটি দরজা ছিল। ইহার মধ্যে প্রধান দরজাটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুরী যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল এবং উহার নাম ছিল "যম দুয়ার"। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গভীর অরণ্য ছিল। এই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ওড়িষ্যা যাইবার পথ বন্ধ থাকিত। কথিত আছে, ওড়িষ্যায় যাইতে হইলে এই দরজার নিকট নারায়ণগড়ের রাজার "ছাড় পত্র" লইয়া তবে যাইতে পারা যাইত। দ্বিতীয় দরজার নাম "সিদ্ধেশ্বর দরজা"। উহার নিকটে সিদ্ধেশ্বর নামে এক শিব ছিলেন। তৃতীয়টির নাম মৃন্ময় দরজা বা "মেটে দুয়ার"। উহার প্রাচীর এত বিস্তৃত ছিল যে তাহার উপর দিয়া তিনজন অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। চতুর্থ দরজাটির কোন চিহ্ন নাই। প্রবাদ উহা কেলেঘাই নদীর মধ্যে কোথাও অবস্থিত ছিল এবং এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে উহা বন্ধ করিয়া নারায়ণগড়ের সমস্ত পথ জলপ্লাবিত করিয়া শত্রুর গতি প্রতিরোধ করা যাইত।

নারায়ণগড়ের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব্ব পাল বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামক এক দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরী যাত্রী মাত্রকেই প্রণামী দিয়া "ব্রহ্মাণী দেবীর ছাপ" নামক এক প্রকার মুদ্রা লইয়া পুরী প্রবেশ করিতে হইত। প্রবাদ ব্রহ্মাণী দেবীর প্রতিষ্ঠার দিন যে ঘৃত প্রদীপ জ্বালা হইয়াছিল, তাহা একাদিক্রমে ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভের মৃত্যুর সাথে সাথে উহা হঠাৎ নিবিয়া যায়। এখনও এই স্থানে মাঘীপূর্ণিমার দিন একটি মেলা বসিয়া থাকে।

নিকটেই রাণীসাগর নামে প্রায় দুইশত বিঘা ব্যাপী একটি জলাশয় আছে। প্রবাদ, রাজা গন্ধর্ব্ব পালের মহিষী রাণী মধুমঞ্জরী রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখেন যে—কুলদেবতা ব্রহ্মাণী দেবী যেন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত কুলগুরুর নিকট ব্যক্ত করিলে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী রাণী মধুমঞ্জরী এই বৃহৎ জলাশয় খনন করান।

সাহজাদা খুররম—উত্তরকালের সম্রাট শাহজাহান, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যখন সম্রাট সৈন্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন, তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার গমনের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁহাকে "মাড়ি সুলতান" বা "পথের রাজা" উপাধি প্রদান করেন। যে ফার্ম্মাণের দ্বারা এই উপাধি প্রদান করা হয় তাহার উপর রক্তচন্দনে সম্রাট শাহ্‌জাহানের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ছিল।

নারায়ণগড়ের নিকটবর্ত্তী কসবা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ্ আছে। এই মসজিদের একটি শিলালেখন হইতে জানা যায় যে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার

তৎকালীন শাসন কর্তা শাহসুজা কর্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদের উপর তিনটি গুম্বজ আছে। উহার মধ্যে একটির এখন ভগ্ন দশা।

কাঁথি রোড—স্টেশনের চলিত নাম বেলদা। এখানে একটি ধর্ম্মশালা আছে। স্টেশন হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা কাঁথির দূরত্ব মোটর বাস যোগে ৪০ মাইল। কাঁথি শহরে প্রভাত কুমার কলেজ নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি সার্ভে স্কুল, একটি গুরু ট্রেনিং স্কুল, ব্রাহ্মসমাজ, হরিসভা ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আছে। কাঁথি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখান হইতে সমুদ্র মাত্র ৫ মাইল দূর। সমুদ্রতীরে দীঘা ও জনপুট নামে দুইটি গ্রামে ডাক্‌বাংলা আছে। অনেকে সমুদ্র দর্শন ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় যাইয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তিতে সমুদ্রস্নানের জন্য জনপুটে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বীরকূল ও চাঁদপুর গ্রামও বেশ স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর, ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পার্ব্বত্য নিবাস যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন অনেক বিশিষ্ট রাজপুরুষ এই সকল স্থানে আসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেন। ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের গ্রীষ্মাবাস ছিল বীরকূল। তখনকার সরকারী কাগজ পত্রে বীরকূলের বহু উল্লেখ আছে।

কাঁথি শহর একটি বালিয়াড়ী বা উচ্চ বালুকা স্তূপের উপর অবস্থিত। এই বালিয়াড়ীটি পূর্ব্বে রশুলপুর নদীর মোহানা হইতে পশ্চিমে সুবর্ণরেখার মুখ পর্য্যন্ত প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। ইহার বিস্তৃতি স্থানভেদে এক মাইল হইতে আধ মাইলের মধ্যে। কাহারও কাহারও মতে বালিয়াড়ী বা বালির কাঁথ হইতে এই স্থানের নাম কাঁথি হইয়াছে। কাঁথি শহর হইতে ৯ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ফুলবাড়ী গ্রাম পরলোকগত জননায়ক দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের জন্মস্থান।

কাঁথি শহরের ৬ মাইল উত্তরে **বাহিরী** নামক একটি প্রাচীন গ্রামে বহু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে ধনটিকরি, গোধনটিকরি, পালটিকরি ও শাপটিকরি নামে চারিটি মৃত্তিকার স্তূপ আছে। প্রবাদ, এইগুলি মহাভারতের বিরাট রাজার গোগৃহের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের মতে এই স্থানে পূর্ব্বে একটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল এবং এই স্তূপ চতুষ্টয় বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পুষ্করিণী খননকালে বৌদ্ধ যুগের প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এখানে একটি প্রাচীন মঠ আছে। উহাতে এখন রামচন্দ্রের মূর্ত্তি পূজিত হয়। এই মঠের চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

এই গ্রামে ভীমসাগর, হেমসাগর ও লোহিত সাগর নামে তিনটি দীঘি আছে এবং তথায় "জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ" নামে একটি পুরাতন তেঁতুল গাছ আছে। এক সময় এই স্থান দিয়া একটি নদী বহিয়া যাইত। বড় বড় নৌকা বাঁধার চিহ্ন এই গাছে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এগরা-হটনগর—কাঁথি শহর হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এগরা থানার হটনগরে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। কথিত আছে ওড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেব এই শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিব মন্দিরের নিকটেই কৃষ্ণসাগর নামে একটি সুন্দর জলাশয় আছে। উহার পশ্চিম কোণে এখন যেখানে ডাকবাংলা রহিয়াছে ঐ স্থানে পূর্ব্বে কাঁথি মহকুমার দপ্তর ছিল। লোকে উহাকে "নেগুয়ার কাছারি" বলিত।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কাঁথি মহকুমার সদর-আলা তখন নেগুয়াতে কাছারি ছিল। পরে উহা উঠিয়া কাঁথি শহরে যায়।

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত **হিজলী** একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা রসুলপুর নদীর তীরে অবস্থিত। কাথি হইতে এই স্থানের দূরত্ব ১৯ মাইল। ইহা একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। এই স্থানটি দেখিতে একটি দ্বীপের মত ও ইহার সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। হিজলীর অনতিদূরে রসুলপুর নদীর অপর পারে দরিয়াপুর ও দৌলতপুর নামক দুইটি গ্রাম আছে। গ্রাম দুইটির নৈসর্গিক শোভা অতি সুন্দর। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কল্যাণে এই নগণ্য পল্লী দুইটি ও রসুলপুর নদী বঙ্গ সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। "কপাল কুণ্ডলার" পরিকল্পনা ক্ষেত্র বলিয়া দরিয়াপুরে একখানি প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু তিথি ২৬এ চৈত্র উপলক্ষে এখানে একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হয় ও কয়েক দিনব্যাপী মেলা বসে। মেদিনীপুর জেলাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হিজলীকে একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করিবার কথাও এক সময়ে হইয়াছিল এবং জেলার সদরের উপযোগী কতকগুলি ভবনও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই বাড়ীগুলি বন্দী-নিবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে হিজলী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তমলুক বন্দরের পতনের পর হিজলী বন্দর বড় হইয়া উঠে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত রালফ্ ফিচের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে সুমাত্রা, মালাক্কা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে হিজলীতে বাণিজ্য পোত আসিত এবং এখান হইতে কাপড়, পশম, চিনি, লঙ্কা, চাউল প্রভৃতি লইয়া যাইত।

য়ুরোপীয় বণিকগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পর্ত্তুগীজেরা এখানে আসেন এবং বাণিজ্যকুঠি ও গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের পর আসেন ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে মগ বোম্বেটেগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য সম্রাট শাহ্জাহান নিম্ন বঙ্গের স্থানে স্থানে "ফৌজদারী" স্থাপন করেন। হিজলীতেও এইরূপ একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল। হিজলীর ফৌজদার উপকূলভাগ পাহারা দিবার জন্য "সরবোলা" নামক এক শ্রেণীর রক্ষী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগেও হিজলীতে কতকগুলি "সরবোলা" ছিল। কিন্তু পরে তাহারা নিজেরাই লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করায় "সরবোলার" কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই নিম্নবঙ্গ বিশেষতঃ হিজলী লবণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সুলতান সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে নিমক মহালের উল্লেখ আছে। নবাবের অধীনে জমিদারগণই এই কারবার চালাইতেন। তৎকালে কাশ্মীরি, শিখ, মুলতানী ও ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চল হইতে লবণ খরিদ করিত। সে সময়ে প্রধান লবণ ব্যবসায়ীরা "ফকর্-উল-তজজব" বা "মালিক-উল-তজজব" ব্যবসায়ীগণের গৌরব বা রাজা উপাধি পাইতেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী লাভের পর হিজলীর লবণের কারবার কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে আসে। পরে এই কারবার উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে উল্লেখ আছে যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় ছাড়িয়া কালীঘাটে যাইবার সময় "ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ"।

সেকন্দর শা যখন গৌড়ের রাজা সে সময়ে হিজলীগড়ে হরিদাস নামে এই প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধকালে সেকন্দর শা ইহার সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু ইনি সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। সে কারণ সেকন্দর হরিদাসের বিরুদ্ধে দক্ষ সেনানায়কের নেতৃত্বে পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। বীর হরিদাস পাঠান সৈন্যকে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া হিজলী হইতে তাড়াইয়া দেন।

মুসলমান যুগে হিজলী "মসনদ-ই-আলা" উপাধিধারী একটি নবাব বংশের রাজধানী ছিল। নবাববংশের প্রায় সকল কীর্ত্তিই সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে হিজলীর পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং রসুলপুর নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি জীর্ণ মসজিদ্ অতীত দিনের সাক্ষ্য দিতেছে; এই মসজিদটির তিনটি গম্বুজ আছে এবং ইহা বেশ উচ্চ। বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতা যাতায়াতের পথে ইহা বহুদূর হইতেই নজরে পড়ে। ইহার প্রাঙ্গনে হিজলী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকজনের কবর আছে। তাজ খাঁর পূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামন্ত ছিল এবং তিনি বঙ্গের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিক বা "বার ভুঁইয়ার" অন্যতম ছিলেন। যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় পিতৃব্য মহারাজ বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিলে বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচুরায়) পিতৃবন্ধু ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে প্রতাপ হিজলী আক্রমণ করেন। কয়েকদিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর ঈশা খাঁ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীর অপর পারে রসুলপুর নদীর যে স্থানে প্রতাপের রণতরী সমূহ ছিল, তাহা আজও "প্রতাপপুর ঘাট" নামে পরিচিত। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী প্রথমে প্রতাপাদিত্যের ও পরে মুঘলদের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ এই ঈশা খাঁকে সোণারগাঁএর ঈশা খাঁ হইতে অভিন্ন মনে করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হিজলীতে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের সহিত নবাব সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ইংরেজের হাত হইতে হিজলীর পুনরুদ্ধারের জন্যই এই যুদ্ধ সংঘঠিত হইয়াছিল। নবাবী ফৌজ প্রথমে দরিয়াপুর গ্রামে ছাউনি করে, পরে ২৮এ মে রসুলপুর নদী পার হইয়া হিজলীর দক্ষিণে এক অরণ্য মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করে। কোম্পানির পক্ষে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন সুবিখ্যাত জব চার্ণক। উভয় পক্ষের মধ্যে ছোট খাট যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং তাহাতে প্রতিদিনই ইংরেজের সৈন্যক্ষয় হয়। ইতিমধ্যে ১লা জুন ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন সৈনিক আসিয়া পৌছিল। জব চার্ণক তখন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। সুসজ্জিত গোরা সৈন্যগণ কুচকাওয়াজ করিয়া হিজলীর দুর্গে প্রবেশ করিবার পর তিনি এক গুপ্তপথে তাহাদিগকে পুনরায় জাহাজঘাটায় পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পুনশ্চ সুসজ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ দুর্গ ও জাহাজঘাটায় যাতায়াত করিতে লাগিল। এই কৌশল বুঝিতে না পারিয়া নবাবী সৈন্য মনে করিল ইংলণ্ড হইতে না জানি কত সৈন্য আসিয়াছে। ভীত নবাব-সেনাপতি সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতেই চার্ণক সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং ২০এ জুন তারিখে সন্ধিপত্র লিখিত হইবার পর তাঁহার দলবল লইয়া উলুবেড়িয়ায় চলিয়া গেলেন।

কাউখালি ও খাজুরী—হিজলীর প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কাউখালি গ্রাম। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রসিদ্ধ আলোক স্তম্ভ (লাইট-হাউস) নির্ম্মিত হয়। ভাগীরথীর তীরে ইহাই সর্ব্বপ্রথম আলোক স্তম্ভ।

কাউখালির ৪।৫ মাইল উত্তরে রসুলপুর নদীর পূর্ব্বতটে খাজুরীগ্রাম। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইহা ভাগীরথীর উপর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কলিকাতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি হয়। তখনকার দিনে বড় বড় জাহাজ খাজুরীতে মাল খালাস ও মাল বোঝাই করিত এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত স্লুপের সাহায্যে মাল আনা-নেওয়া করা হইত। তৎকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙালী খাজুরীতে যাইতেন। কলিকাতা হইতে খাজুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই ভারতের সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ জল প্লাবনের ফলে খাজুরী বন্দর ধ্বংস হইয়া যায়। এখন মাত্র দুইটি বাড়ী ও ইংরেজদের একটি সমাধি ক্ষেত্র খাজুরীর অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহার একটি বাড়ী এখন ডাক্‌বাংলা এবং অপরটি ডাকঘর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দাঁতন—খড়্গপুর জংশন হইতে দাঁতন ৩২ মাইল দূর। দাঁতনে একটি মুনসেফী আদালত আছে। এখানে উত্তম জাঁতি প্রস্তুত হয়। প্রবাদ, ওড়িষ্যা যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে দাঁতন বা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। এই আখ্যানটির প্রমাণ স্বরূপ স্থানীয় একটি মন্দিরে প্রস্তরীভূত দন্তকাষ্ঠ রক্ষিত আছে। দাঁতনে জগন্নাথদেবের ও শ্যামলেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির আছে।

কেহ কেহ বলেন যে দাঁতনের প্রাচীন নাম দন্তপুর। "দাঠাবংশ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ক্ষেম নামে বুদ্ধদেবের এক শিষ্য বুদ্ধের চিতা হইতে একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়া উহা কলিঙ্গ রাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দন্তটিকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থানটির নাম দেন দন্তপুর। ব্রহ্মদত্তবংশের শিবগুহ নামক জনৈক নৃপতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তাঁহার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু একবার দন্তপুরের দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হন ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ এই জন্য তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহার শাস্তি-বিধানের জন্য পাটলিপুত্রের হিন্দু নরপতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাটলিপুত্ররাজের সৈন্য শিবগুহকে বন্দী করিয়া তৎসহ বুদ্ধদন্তটিকেও পাটলিপুত্রে আনয়ন করে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাটলিপুত্রে বহু আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটায় পাটলিপুত্ররাজ ভীত হইয়া বুদ্ধদন্তসহ শিবগুহকে পুনরায় দন্তপুরে প্রেরণ করেন। পাটলিপুত্ররাজের মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক রাজা দন্তপুর আক্রমণ করিয়া শিবগুহকে নিহত করেন। রাজকুমারী হেমমালা এবং রাজমাতা উজ্জয়িনীরাজকুমার ছদ্মবেশে বুদ্ধদন্তটি লইয়া তাম্রলিপ্তের পথে সিংহলে গমন করেন। সিংহলরাজ মেঘবাহন পরম ভক্তি সহকারে ধর্ম্মমন্দিরে দন্তটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও সিংহলে এই বুদ্ধদন্ত নিত্য পূজিত হইতেছে। দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন্ সিংহলে মহাসমারোহে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

দন্তপুর নগরের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রীকে প্রাচীন দন্তপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কাহারও মতে পুরী বা জগন্নাথধামই দন্তপুর এবং জগন্নাথের মন্দিরই প্রাচীন দন্তমন্দির। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ মনীষীর মতে বর্ত্তমান দাঁতনই
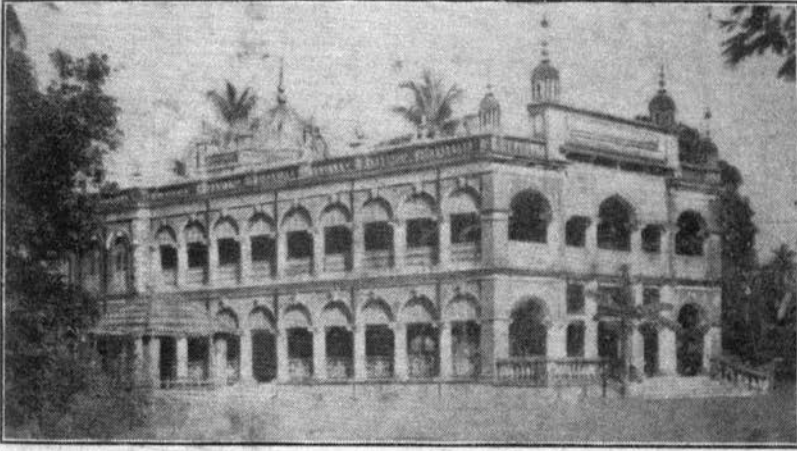
শঙ্কর মঠ, রামরাজাতলা (পৃষ্ঠা ১৩০)

শ্মশানেশ্বর মন্দির, মৌড়িগ্রাম (পৃষ্ঠা ১৩০)
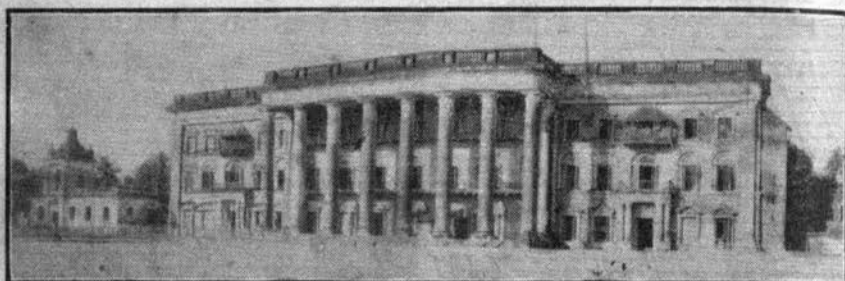
রাজবাড়ী, আন্দুল (পৃষ্ঠা ১৩১)

রূপনারায়ণ সেতু, কোলাঘাট (পৃষ্ঠা ১৩২)

রাজবাড়ী ও খাটপুকুর, তমলুক (পৃষ্ঠা ১৩৬)
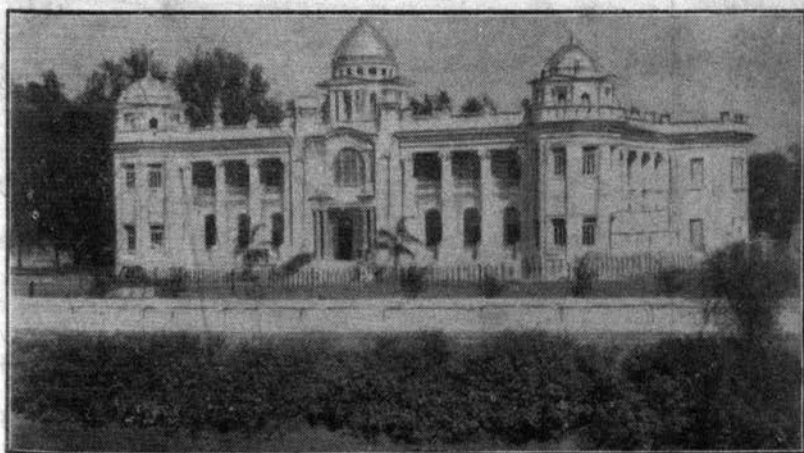
রাজবাটী, মহিষাদল (পৃষ্ঠা ১৩৭)
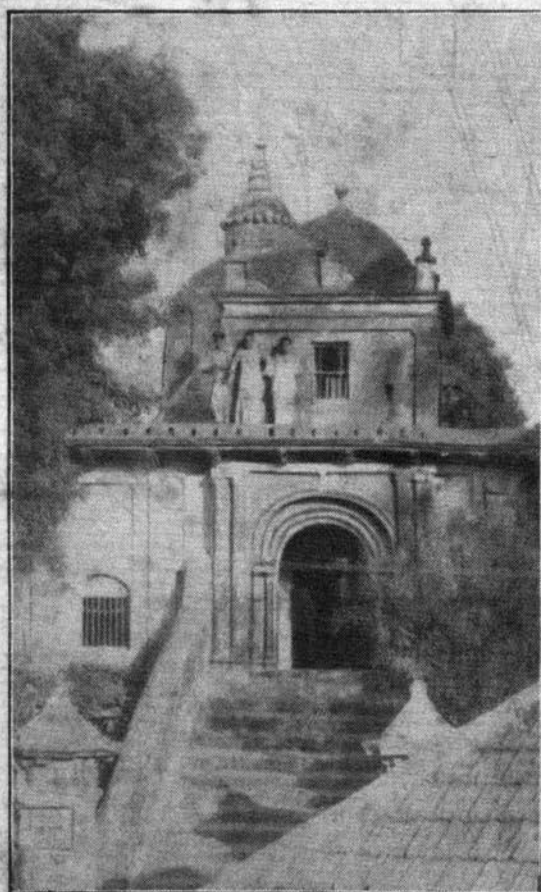
বর্গভীমার মন্দির, তমলুক (পৃষ্ঠা ১৩৫)
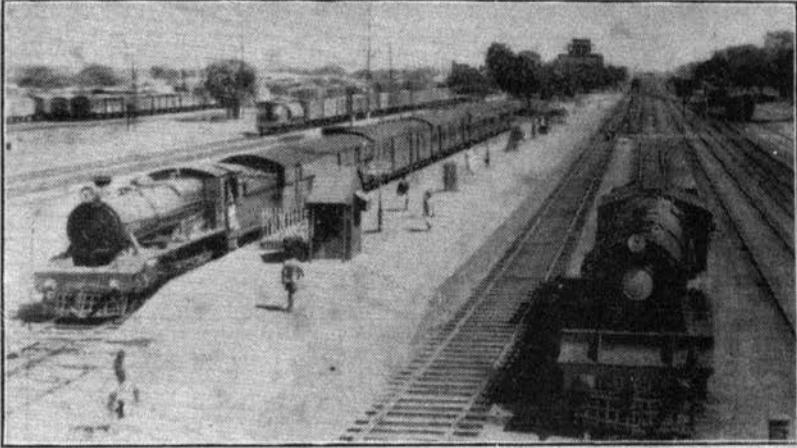
প্লাটফরম—খড়গপুর (পৃষ্ঠা ১৩৮)
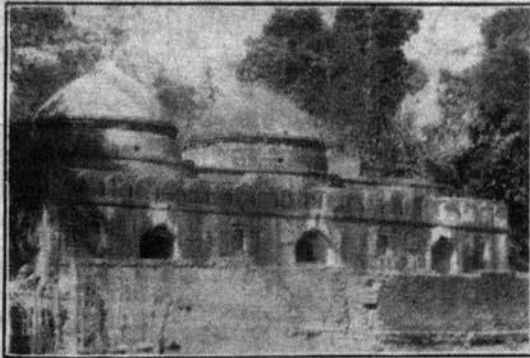
শাহসুজার মসজিদ, কসবা, নারায়ণগড (পৃষ্ঠা ১৪১)

সমুদ্রতীর, কাঁথি (পৃষ্ঠা ১৪১)
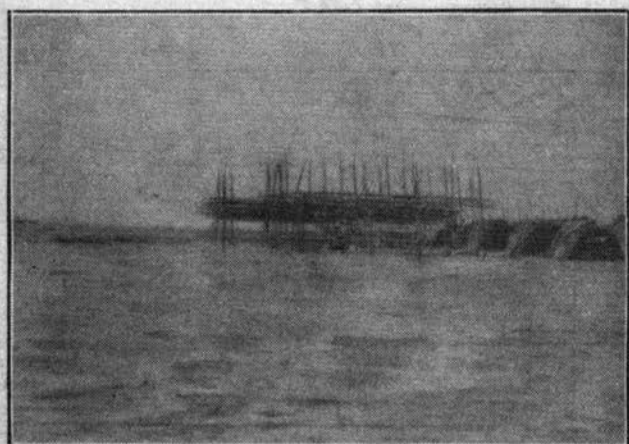
জনপুটের সমুদ্রতীর (পৃষ্ঠা ১৪১)

ডাকবাংলা, দরিয়াপুর (পৃষ্ঠা ১৪২)
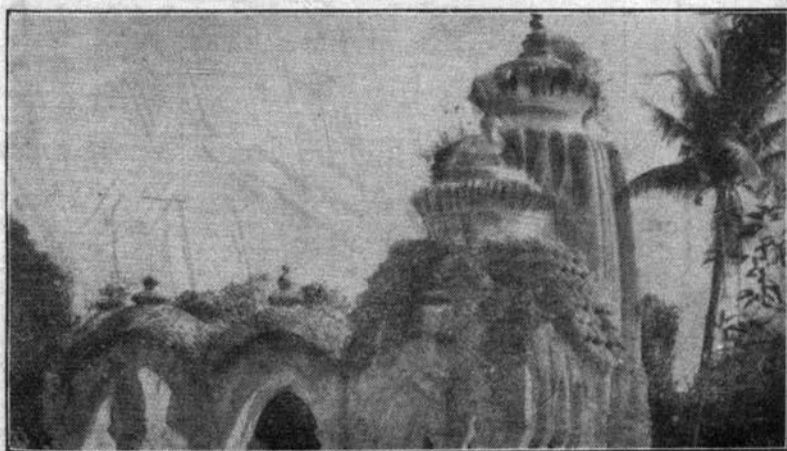
প্রাচীন শিবমন্দির, এগরা-হটনগর (পৃষ্ঠা ১৪১)
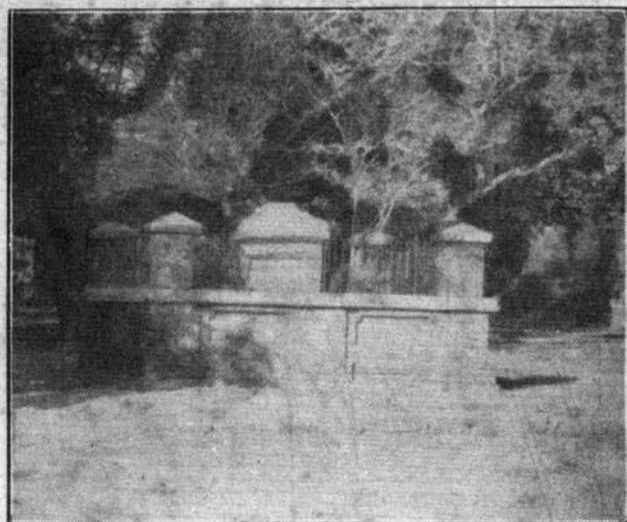
"কপাল কুণ্ডলার" পরিকল্পনা ক্ষেত্র (পৃষ্ঠা ১৪২)

শ্যামলেশ্বরের মন্দির, দাঁতন (পৃষ্ঠা ১৪৪)

প্রাচীন দন্তপুর। দাঠাবংশে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে তাম্রলিপ্ত হইতেই বুদ্ধদন্ত সিংহলে প্রেরিত হয়। পুরীও তৎকালে একটি প্রধান বন্দর ছিল। সুতরাং পুরী বা রাজমহেন্দ্রী হইতে দন্তটি পুরীবন্দর দিয়াই প্রেরিত হইবার কথা। তাম্রলিপ্ত হইতে উহা প্রেরিত হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে নিকটস্থ দাঁতনই প্রাচীন দন্তপুর। দাঁতন যে একটি বহু পুরাতন স্থান তাহা এখনও দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

দাঁতনের অনতিদূরে শরশঙ্ক নামে একটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৫,০০০ ফুট ও প্রস্থ ২,৫০০ ফুট। বাংলাদেশে এরূপ দীঘি অতি অল্পই আছে। জনশ্রুতি যে শশাঙ্কদেব নামক জনৈক নৃপতি পুরীগমন কালে বাংলা ও ওড়িষ্যার সীমান্তে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। দাঁতনে "বিদ্যাধর" নামে পরিচিত ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ অপর একটি দীঘি আছে। বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রীর দ্বারা ইহা খনিত হইয়াছিল বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ, মাটীর নীচে দিয়া শরশঙ্ক ও বিদ্যাধর দীঘিকে সংযুক্ত করিয়া ৪ হাত উচচ ও ৩ হাত প্রশস্ত একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুড়ঙ্গ আছে।

মোগল্‌মারী—দাঁতন হইতে দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে "শশিসেনার পাঠশালা" নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই স্থানে রাজা বিক্রম কেশরীর কন্যা শশিসেনা বা সখীসেনার সহিত অহিমাণিকের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং প্রথম হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। শশিসেনা ও অহিমাণিকের প্রণয়-কথা কবি ফকিররামের "সখিসোনা" কাব্যে বিবৃত হইয়াছে।

মোগলমারী গ্রামে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে তোড়রমল পরিচালিত মুঘল বাহিনীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে সোলেমান কররানীর পুত্র দাউদ শাহ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও মুঘল পক্ষের বহু সেনা নিহত হয়। সেই জন্য এই গ্রামের নাম হয় "মোগলমারী"।

(খ) খড়্গপুর—আদড়া

মেদিনীপুর—খড়গপুর জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। মেদিনীপুর শহরটি খুব প্রাচীন। রাজা প্রাণকরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মেদিনীকোষ অভিধান প্রণেতা মেদিনীকর কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে, এবং সেই জন্যই ইহার নাম মেদিনীপুর। আইন-ই-আকবরীতে একটি সুবৃহৎ নগর বলিয়া মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে।

এখানে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ আছে। কবে কাহার দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ মেদিনীকর কর্তৃক নগর স্থাপনের সময়েই ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মুঘলযুগে ইহা একটি প্রধান সেনা-নিবাস ছিল। নবাব আলিবর্দ্দী, নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা, মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতি এই দুর্গে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিছুকালের জন্য ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় মেদিনীপুর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও ইহা সেনা-নিবাস রূপে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর কিছুদিন ইহা জেলখানায় পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা পরিত্যক্ত এবং পুরাতন জেলখানা নামে পরিচিত।

মেদিনীপুর শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। রেল স্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে "গোপ" নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, এই স্থানে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার দক্ষিণ গো-গৃহ ছিল। দেখিলে মনে হয় গোপগিরি পূর্ব্বে একটি দুর্গ ছিল এবং তদুপযোগী করিয়া পাহাড়টিকে কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরে দুইটি দুর্গের উল্লেখ আছে। একটির কথা বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন দ্বিতীয় দুর্গটি এই গোপ-গিরি। এখন এই পাহাড়ের উপর মেদিনীপুর জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার নাড়াজোলের রাজভবন অবস্থিত।

মেদিনীপুরের প্রান্তবাহিনী কাঁসাই নদীর উপর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি সেতু আছে। এই সেতুর নিকট হজরত পীর লোহানির সমাধি অবস্থিত। পীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র। সমাধির নিকটেই একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির আছে। কথিত আছে, ইহা রঙ্কিনী দেবীর মন্দির এবং পূর্ব্বে নাকি পালা করিয়া গ্রামবাসিগণকে এই দেবীর নিকট প্রত্যহ একটি নরবলি দিতে হইত। একদিন একটি অসহায়া বিধবার একমাত্র পুত্রের পালা উপস্থিত হওয়ায় বিধবার করুণ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া পীরসাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্ত্তে স্বয়ং দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবীর সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবী পরাজিত হইয়া মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিমদিকে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন এবং এক রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরকালে এই রজক নাকি দেবীর অনুগ্রহে ধলভূমের রাজা হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর শহরে মুসলমানগণের আরও একটি পবিত্র স্থান আছে। উহা সুবিখ্যাত পীর হজরত মুরসেদ আলি শাহসাহেবের দরগাহ্ এবং খানকা শরীফ নামে পরিচিত। এখানে প্রতি বৎসর শাহ্ সাহেবের উরস্ বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ওড়িয়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির, বর্গীদের সময়ের শীতলা মন্দির, হনুমানজীর মন্দির, বিবিগঞ্জের দুর্গা মন্দির, কর্ণেলগোলার রাম মন্দির, শিববাজারের দ্বাদশ শিবালয় ও রাসমঞ্চ এবং হবিবপুর ও নূতন বাজারের কালী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুরের জজ-আদালতের নিকটে ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি স্তম্ভে ইংরেজী ও বাঙলায় লিখিত দুইখানি প্রস্তরফলক আছে। ইংরেজের সমাধিগাত্রে বাঙলা ভাষায় লেখা প্রস্তরফলক বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রস্তরফলকখানির প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল:—

"শ্রীরাম মেস্ত্র জন পিয়ার্শ সাহেব জেলা মেদিনীপুর বারো বৎসর কেলক্টার কাজ করিয়া সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই সন ১১০৫ বাঙ্গলা ১১ই জৈষ্ঠ কাল হইয়াছে—তাহার কবরে এই কিত্তি করিয়া দেওয়া গেল।"

মেদিনীপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি উচচ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। শহরের গেড়েরী সম্প্রদায় সুন্দর কম্বল প্রস্তুত করে। ইহারা চার পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে এবং নিজেরাই মেষ পালন করে।

ইতিহাস বিশ্রুত সিপাহী বিদ্রোহের সময় ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎকালীন মেদিনীপুরের অবস্থা তিনি তাঁহার আত্মচরিতে সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহী পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। ....উক্ত তেওয়ারী ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসী দেন। ....তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ Phoenix কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবেরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। একদিন সাহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া সিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান দূর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া শপথ করিতে বলিলেন যে, সে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না।

আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টুলেনের ভিতর ধুতী পরিয়া কাজ করিতাম। যখন সিপাহী আসিবে প্যাণ্টুলুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টুলেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। ....একদিন জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে সিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া আওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল। আমরা মনে করিলাম, সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। ....আমরাও প্যাণ্টুলুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম এমন সময় আমরা শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মাষ্টমীর পর্ব্বোপলক্ষে এইরূপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইলাম। ....সংবাদপত্রে এইরূপ মিথ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে Shekwattee

Battalion মেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে এই পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।"

মেদিনীপুর শহরের অন্তর্গত নরমপুরে একটি অসমাপ্ত মস্‌জিদ্ আছে। কথিত আছে শাহজাদা খুরম (সম্রাট শাহজাহান) দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার পথে যে দিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন সে দিন ঈদ্ পর্ব্ব থাকায় তাঁহার নমাজের জন্য একদিনেই এই মসজিদ্‌টি নির্ম্মিত হয়। সময়ের অল্পতার জন্য ইহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। খুরম ইহাতেই নমাজ পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার স্মারকরূপে মসজিদ্‌টিকে অসমাপ্ত অবস্থায়ই রাখা হইয়াছে।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িষ্যা যাইবার সময় মেদিনীপুরের পথে গমন করিয়াছিলেন।

কর্ণগড়—মেদিনীপুর হইতে ৬ মাইল উত্তরে শালবনি থানায় অবস্থিত কর্ণগড় একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সিংহ উপাধিধারী এক রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই বংশীয় রাজা মহাবীর সিংহের নির্ম্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গের মধ্যে একটি সরোবর ও তন্মধ্যস্থ একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রবাদ, কর্ণগড়ে দাতাকর্ণের বাটী ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "রামচরিতম্" নামক সংস্কৃত কাব্যে কর্ণকেশরীর উল্লেখ আছে। বিখ্যাত "শিবায়ন" প্রণেতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বরদা ঘাটালের রাজা শোভাসিংহের অত্যাচারে স্বীয় জন্মভূমি যদুপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গড়টি প্রায় দুই মাইলব্যাপী ছিল এবং সদর ও অন্দর দুই মহালে বিভক্ত ছিল। গড়ের তিন দিকে জঙ্গল এবং পূর্ব্বদিকে কৃষিক্ষেত্র। জঙ্গল হইতে একটি নদী বাহির হইয়া গড়ের দুইদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় একত্র হইয়াছে। ইহাতে গড়ের একটি স্বাভাবিক পরিখার সৃষ্টি হইয়াছে।

গড়ের দক্ষিণদিকে অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির অবস্থিত। প্রস্তরনির্ম্মিত এই মন্দির দুইটি অতি দৃঢ় ও ইহার নির্ম্মাণকৌশলও অতি সুন্দর। মহামায়ার মন্দিরে যে পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন আছে, প্রবাদ যে তথায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মন্দিরের তোরণ-দ্বারে "যোগী ঘোপা" বা যোগমণ্ডপ নামে যে ত্রিতল পাথরের মন্দির আছে তাহাও দেখিবার মত বস্তু।

মেদিনীপুর হইতে এক মাইল উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার নিকট আবাসগড়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাজা রামসিংহ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ইহা নির্ম্মাণ করেন। কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের রাজা মোহনলাল খাঁ ইহার বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গড়ের ভিতরে প্রকাণ্ড দীঘির তীরে নবচূড়া সমন্বিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। এই গড়ে দশভুজা, জয়দুর্গা, রাধাশ্যাম, শ্যামসুন্দর ও রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি অপরাপর বিগ্রহও আছেন।

বর্গীর উপদ্রবের ন্যায় চুয়াড় উপদ্রবও মেদিনীপুর জেলাকে বিশেষ বিপর্য্যস্ত করে। চুয়াড়গণ জেলার জঙ্গল মহালের অধিবাসী বন্যজাতি। শিকার, দস্যুবৃত্তি ও জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্য্য করাই তাহাদের পেশা ছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ইংরেজের অধিকারে আসিলে জমিদারগণকে বশে আনিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি জঙ্গল মহালের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। সৈন্য সংগ্রহে কোম্পানির কিছু বিলম্ব ঘটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথা প্রচারিত হওয়ায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০০ মাইল ব্যাপী জঙ্গল মহালে ঘোর বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। লেফটেন্যাণ্ট ফার্গুসন সাহেবকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। চুয়াড়গণের বিষাক্ত শরে ও ব্যাধিতে অনেক ইংরেজ সৈন্যের প্রাণহানি হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়কে কেন্দ্র করিয়া তাহারা নানাস্থানে আক্রমণ চালাইতে থাকে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কোম্পানি কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করেন। চুয়াড়দিগের সমুদয় আডডা ভাঙ্গিয়া দিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। জায়গীর জমি কোম্পানি কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইবার ফলেই চুয়াড়েরা বিদ্রোহী হইয়াছিল।

গোদাপিয়াশাল—খড়গপুর হইতে ১৩ মাইল। এখানে কুমারগড় নামক একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা চাঙ্গুয়ালরাজ বীরসিংহের বংশধর রাজা কুমারসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই বংশীয় রাজা জামদার সিংহ নির্ম্মিত জামদারগড়ের ভগ্নাবশেষ গোদাপিয়াশালের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানেই মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানি তাঁহাদের গোদাপিয়াশাল কুঠি নির্ম্মাণ করেন।

চন্দ্রকোণা রোড—খড়গপুর জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে চন্দ্রকোণা শহর মোটরবাসযোগে ২১ মাইল। ইহা ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত। প্রবাদ যে বহুকাল পূর্ব্বে এখানে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে চন্দ্রকোণা নাম হইয়াছে। রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও চন্দ্রকোণার প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করে।

কথিত আছে, এককালে চন্দ্রকোণা নগরে বাহান্নটি বাজার ছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যালেণ্টাইনের মানচিত্রে চন্দ্রকোণাকে (Sjandercona) শিলাবতী নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া দেখান হইয়াছে।

চন্দ্রকোণার দক্ষিণে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের দ্বাদশদ্বারী বা "বার দুয়ারী" নামক গড়ের ভগ্নাবশেষের নিকটেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বর ও উজ্জনাথ শিব আজিও বিদ্যমান। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজারিগণ মল্লেশ্বরকে প্রস্তর দিয়া মুড়িয়া ফেলেন ও উজ্জনাথকে লইয়া এক বটবৃক্ষ মূলে স্থাপন করেন। কালাপাহাড় শূন্য মন্দির ধ্বংস করিয়া চলিয়া যান। মল্লেশ্বরের বর্ত্তমান সুন্দর মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত। মল্লেশ্বর আজিও প্রস্তরাবৃত আছেন। ইঁহার মন্দিরের নিকটে উন্মুক্ত আকাশতলে এক বটবৃক্ষের মূল আশ্রয় করিয়া উজ্জনাথ মহাদেব বিদ্যমান। যতবারই ইঁহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে ততবারই তাহা বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনার দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকোণার লালজীউ, রঘুনাথজীউ ও কামেশ্বর মহাদেবও বিশেষ প্রসিদ্ধ। দশহরা ও রথযাত্রা এবং রঘুনাথজীউর পুষ্যা উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রকোণায় বিস্তর জনসমাগম হয়।

চন্দ্রকোণায় রাজমাতা লক্ষ্মণাবতীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "রাজার মার পুকর" নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। "রাজার মার কালীও" বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রকোণায় বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি মঠে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিম ভারতীয় তিন জন বৈষ্ণব মোহান্ত এই আখড়া তিনটির পরিচালক। এখানে নানকপন্থীদেরও একটি মঠ আছে।

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রকোণার অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে উঠিয়া যান।

চন্দ্রকোণার কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রকোণার চার পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে আক্‌রা গ্রামে "ছোট দীঘি" নামে একটি অতি বৃহৎ দীঘি আছে। একপার হইতে ইহার অপর পার দৃষ্ট হয় না। ইহা কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা যায় নাই। এখানে "বড় দীঘি" নামে অপর একটি বৃহত্তর দীঘি ছিল। উহা ভরাট হইয়া এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

চন্দ্রকোণা রোড হইতে মোটরবাসযোগে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঘাটালে যাওয়া যায়। ঘাটাল রূপনারায়ণ নদের উভয় তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানকার দধি, ঘৃত ও মাটির হাঁড়ি খুব বিখ্যাত।

ক্ষীরপাই—ক্ষীরপাই ঘাটাল মহকুমার একটি বড় গ্রাম। পূর্ব্বে ইহা একটি মহকুমার সদর ছিল। এক সময়ে এখানে ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ কেম্পানির কুঠি ছিল। নিকটবর্ত্তী কাশীগঞ্জ গ্রামে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি বৃহৎ কুঠি ছিল। উহার নিকটেই বেড়াবেড়া পল্লীতে য়ুরোপীয়গণের ছয়টি সমাধিস্তম্ভ আছে। সেকালে য়ুরোপীয় বণিক বা কর্ম্মচারীদের সহিত এদেশের লোকেদের বিশেষ মেলামেশা ও সখ্য ছিল। সেই প্রাচীন বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া আজও এই পল্লীর অধিবাসীরা কোন শুভকার্য্য বা পর্ব্ব উপলক্ষে এই বিদেশীয়গণের জীর্ণ সমাধির সম্মুখে দীপ দান করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মানুষের সহিত মানুষের মিলনের পরিচায়ক হিসাবে বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে "সন্ন্যাসী হাঙ্গামার" সময় একদল সন্ন্যাসী ক্ষীরপাই গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে থাকে। মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট্ সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অনেককে হত ও আহত করিয়া এই উৎপাত দমন করেন।

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মপল্লী বীরসিংহ গ্রাম ক্ষীরপাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

গড়বেতা—খড়গপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। গ্রামের মধ্যে রায়কোটা নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই দুর্গটির উত্তরে লাল দরজা, পূর্ব্বে রাউতা দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা নামে চারিটি দরজা ছিল। আজিও স্থানীয় লোকে উহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। এই দুর্গটি বগড়ীর চৌহানদিগের

গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গড়ের উত্তরদ্বারের সম্মুখে সাতটি পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রাচীন আমলের প্রস্তরনির্ম্মিত সাতটি মন্দির আছে। ইহাও চৌহানদিগের কীর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। এখানকার সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, কামেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার সর্ব্বমঙ্গলাই সমধিক খ্যাত। কবে এবং কাহার দ্বারা এই মন্দিরটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ ইহার প্রতিষ্ঠাতা, আবার কাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কোন সিদ্ধপুরুষ অরণ্যমধ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য নাকি গড়বেতায় আগমন করিয়া এই স্থানে শবসাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবী তাল ও বেতাল নামে স্বীয় অনুচরদ্বয়কে বিক্রমাদিত্যের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য নিযুক্ত করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই আদেশ সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্দিরদ্বার পূর্ব্বদিক হইতে উত্তরদিকে পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ করেন। এই আদেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হয়। তদবধি এই মন্দিরটি উত্তরদ্বারী। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী সাধারণ মন্দির হইতে বিভিন্ন। মন্দিরদ্বার হইতে একটি প্রশস্ত অথচ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে যাইয়া পাষাণময়ী দেবীপ্রতিমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। দেবীর পার্শ্বে সর্ব্বক্ষণই একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়। প্রবাদ, দেবীর পার্শ্বে যে পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে তাহার উপর বসিয়া রাজা গজপতি ও বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। গড়বেতায় একটি মুনসেফী আদালত আছে।

বগড়ী রোড—খড়গপুর হইতে ৪০ মাইল। স্টেশন হইতে বগড়ী-কৃষ্ণনগর গ্রাম আড়াই মাইল। অনেকের মতে বগডিহি বা বক রাক্ষসের বাসস্থান হইতে "বগড়ী" শব্দের উৎপত্তি। প্রবাদ, পুরাকালে এই স্থানে নাকি মহাভারতোক্ত বক রাক্ষসের রাজ্য ছিল। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা বিদুরের পরামর্শ মত নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণদিকে অরণ্য সমাবৃত এই স্থানে উপনীত হন। বক রাক্ষস প্রত্যহ একটি করিয়া মানুষ ভক্ষণ করিত। ভীমের হস্তে বক রাক্ষসের নিধন ঘটে।

বগড়ী-কৃষ্ণনগর একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়জীর একটি সুন্দর পাষাণ নির্ম্মিত বিগ্রহ ও মন্দির আছে। দোলযাত্রার সময় এখানে একটি বড় মেলা হয় ও তাহাতে বাংলার নানাস্থান হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। প্রবাদ, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। পরে বগড়ীর রাজা রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণমূর্ত্তির পার্শ্বে রাধিকা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন। বগড়ীর নিকটে ভিকনগর ও গনগণির মাঠ নামক দুইটি স্থান আছে। প্রবাদ, পাণ্ডবেরা ভিক্‌নগর হইতে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন। শিলাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গনগণির মাঠে ভীম কর্ত্তৃক বক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। এই মাঠের উপর কতকগুলি প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ডকে লোকে বক রাক্ষসের অস্থি বলিয়া দেখাইয়া থাকে। বগড়ী-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী মহাভারতোক্ত একচক্রপুর বা একারিয়া গ্রামে সপুত্র কুন্তীদেবী যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন লোকে আজিও তাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

জঙ্গলমহালের চুয়াড়দিগের দমনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নাএক নামে বন্যজাতি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে বিদ্রোহী হয়। নাএকরা প্রায় চুয়াড়দিগেরই মত। তাহারা ধর্ম্মে হিন্দু ছিল এবং গো-ব্রাহ্মণের উপর তাহাদের অত্যন্ত ভক্তি ছিল; বগড়ীর রাজবংশ কর্ত্তৃক প্রদত্ত জায়গীর তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিত এবং প্রয়োজন হইলে

রাজ সরকারে সৈনিক বা পাইকের কাজ করিত। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাএকদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। নাএকগণ ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া অচলসিংহ নামক একজন সাহসী পুরুষের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা গভীর অরণ্য আশ্রয় করিয়া নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকলের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে সুরু করে। ইহাই "বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। নাএকগণের উপদ্রবে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার বহুস্থান বিপন্ন হইয়া উঠে। পূর্ব্বোক্ত গনগণির মাঠে তাহাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ব্রিটিশ সৈন্য এই অরণ্যচারী জাতির সহিত যুদ্ধে ততটা সুবিধা করিতে পারে নাই, পরে বহু কামান একত্রে দাগিয়া তাহারা নাএকদিগের সমস্ত আড্ডা ধ্বংস করে। এই যুদ্ধে বহু নাএক সৈন্য প্রাণত্যাগ করে ও অনেকে বন্দী হয়। নায়ক অচল সিংহ কিন্তু পলাইয়া চলিয়া যায়। পরে অচল সিংহ আর একদল নাএকসৈন্য লইয়া বর্গীদের দলে যোগ দেয় ও ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানসমূহে ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে। প্রথমদিকে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারে নাই। অবশেষে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহের সাহায্যে অচলসিংহ ধৃত হয়। অচলসিংহের পরেও নাএকগণ আরও কিছুদিন ধরিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। অবশেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে প্রায় ২০০ নাএক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় ও ১৭ জন দলপতিকে প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপুর—খড়্গপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল দূর। ইহা বাঁকুড়া জেলার মহকুমা ও প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। রঘুনাথ বা আদিমল্ল মল্লভূমরাজ্য ও মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কতকাংশ এবং ছোট নাগপুরের অধিত্যকা ভূমির কতকাংশ লইয়া মল্লভূম রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ, সপ্তম শতাব্দীতে তীর্থকামী কোন ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী বৃন্দাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রের পথে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করার পর মৃত্যুমখে পতিত হন। পুত্রটি স্থানীয় কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক লালিত পালিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহে ক্ষত্রোচিত বলবীর্য্যের বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং সে মল্লক্রীড়ায় অপরাজেয় হইয়া উঠে। এই বালকই উত্তরকালে আদিমল্ল বা রঘুনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় পরাক্রমবলে বহু সামন্ত রাজা ও সর্দ্দারকে পরাস্ত করিয়া এক বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যই মল্লভূম নামে খ্যাত। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুরে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রঘুনাথ মল্লের উনবিংশ বংশধর জগৎমল্ল বিষ্ণুপুরের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

বহু শতাব্দী ধরিয়া মল্লরাজগণ বাংলার পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগেও বহুকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিষ্ণুপুরের রাজারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। জগৎমল্লের পর রামমল্লের সময়ে সেনাবাহিনীর রণনৈপুণ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিবসিংহ মল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে ললিত কলার বিশেষতঃ সঙ্গীত সাধনার বিকাশ ঘটে। ধারীমল্লের পুত্র বীর হাম্বীরের সময়ে মল্লভূমরাজ্য উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করে। তিনি সেনাবাহিনীর ও দুর্গের পুনর্গঠন করেন এবং তাঁহারই সময়ে মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর হাম্বীরের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। দুর্গের পূর্ব্বদ্বারে মৃত নবাব সৈন্যের এত শবদেহ জমিয়াছিল যে উহা "মুণ্ডমালাঘাট" নামে আখ্যাত হয়।